আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ

মো. ওবায়দুল হক বাদল

তওহীদ প্রকাশন

আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ

মো. ওবায়দুল হক বাদল

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়	:	তওহীদ প্রকাশন, ১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ tawheedprocation@gmail.com
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	:	মোস্তাফিজুর রহমান অপু
লে-আউট কম্পোজিশন	:	হেলাল উদ্দিন
আর্ট	:	ইমন হাসান দুর্জয়
প্রুফ রিডিং	:	হাসান মাহদী
মূল্য	:	২৫০ টাকা
সর্বস্বত্ব	:	প্রকাশক

'AREKTI BISSWOJUDDHO' A Drama By 'Md. Obaydul Huq Badol', Published By 'Tawheed Prokashon', 139/1, Tezkunipara, Tezgaon, Dhaka-1215.

উৎসর্গ

যে ঘন কুয়াশায় আলো হয়ে
এসেছে। পরম স্নেহের ‘আভা’ কে।

লেখকের কথা

নাটকে প্রেম থাকবে, রস থাকবে, ট্র্যাজিডি থাকবে, বিবেক থাকবে, ক্লাইমেক্স থাকবে, আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না সব থাকবে। যা প্রত্যেকটি জীবনেও থাকে। জীবন যখন করুণ অথবা দারুণভাবে নাটকীয় মোড় নেয় ঠিক তখনি সেটা নাটক হয়ে ওঠে।

আসুন অশ্লীলতাকে না বলি। সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার দ্বারকে উন্মুক্ত করি।

ভূমিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম শব্দটির নাম 'যুদ্ধ'। তবে ইতিহাস বলে যুদ্ধ যেমন মহাপ্রলয় নিয়ে আসে তেমনি যুদ্ধ সবকিছুকে ভেঙে চুরমার করে নতুন সভ্যতার বার্তাও নিয়ে আসে। তবুও যুদ্ধ কেউ চায় না। কিন্তু যুদ্ধ বেঁধে যায়। কখনো কখনো যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। যুদ্ধের মাধ্যমে পরাশক্তিগুলো বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণ করে, যুদ্ধের পথ ধরে মুক্তিকামী জনতা মুক্তির পথ খুঁজে পায়। যুদ্ধের ধর্ম এটাই।

বিগত শতাব্দি ধরে সমাজতান্ত্রিক ব্লক আর গণতান্ত্রিক ব্লক অস্ত্র হাতে একে অপরের দিকে তাক করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এ স্নায়ু যুদ্ধ যেনো আটশত কোটি বনি আদমকে বারুদের পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়ে রেখেছে। বারুদের এ উত্তপ্ত পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক রূপ আছে। তারই প্রথম ধাপ বোধ হয় দেখতে যাচ্ছি আমরা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের অসারতা, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে দুই সমাজব্যবস্থার চলমান কোন্দল, কাঁদা ছোঁড়াছুড়ির ইতিবৃত্ত, একটি অবয়ব ফুটে উঠেছে 'আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ' নাটকে। তরুণ নাট্যকার সুনিপুণভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন পরষ্পর ভিন্ন মতাবলম্বী দুই সহোদরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

ইউক্রেনের যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার একটি পরিবারের সাথে বাংলাদেশি এক স্টুডেন্টকে যুক্ত করে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে নাটকীয়তার ভিতর দিয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক সঙ্কট ও সামাজিক অস্থিরতার চিত্রও এতে উঠে এসেছে।

নাট্যকারের সাফল্য শুধু পাঠকপ্রিয়তায় নয় বরং নাটকের সফল নাট্যরূপ বা মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে সংলাপ ও অভিনয় দক্ষতার পথ ধরে সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখার মধ্যে। আমি তরুণ নাট্যকার ওবায়দুল হক বাদলকে তার নাট্যজগতে সাহসী অভিযাত্রায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাফর আহমদ

লেখক ও গবেষক।

৬

সূচিপত্র

১. আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ৭

২. ভালো হয়ে যা মাসুদ ২০

৩. সংবাদপত্র ৫০

৪. অভিলাষ ৫৪

৫. তেলকাণ্ড ৬৬

৬. ঋণ ৭০

৭. অর্থনৈতিক ব্যায়াম ৭৩

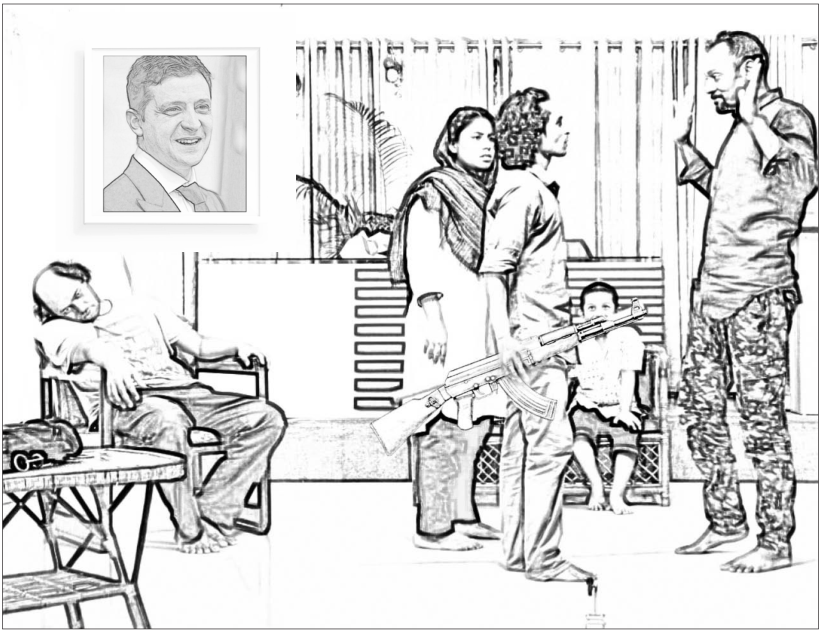

আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ

[কিয়েভ শহরের একটি ফ্ল্যাট। শহরের বাইরে রুশ বাহিনীর সাথে ইউক্রেন বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলছে। মানবিক করিডোর ধরে প্রায় সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। ম্যাক্সিম পরিবার এখনো শহর ছাড়েনি। পরিবারে সবাই ড্রইং রুমে বসে আছে। একটি ছোফা। একটি টেবিল। ১/২টি চেয়ার। টেবিলে ভ্লাদিমির পুতিনের একটা 4R সাইজের ছবি। আর দেয়ালে ভ্লাদিমির জেলেনস্কির 10Rএকটা বড় ছবি ফ্রেমে ঝুলছে। ঘরের এক কোনে একটি ফায়ারপ্লেস। একপাশের দেয়ালে একটি বড় ওয়ালম্যাট। বাবা ম্যাক্সিম হুইল চেয়ারে বসা। তার চেহারায় হতাশার ছাপ। মা এলিজাবেথ ছোট ছেলে পিটারকে কোলে নিয়ে সোফায় বসা। তার চোখে মুখে ভীতি। বড় ভাই আলেকজান্ডার টেবিলে ঝুঁকে পরে মানচিত্র দেখছে আর ভাবছে। তার চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। দূর থেকে কিছুক্ষণ পরপর ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ- ট্যা ডা ট্যা ডা ডা ঠুস... ট্যা ডা ট্যা ডা ... বুম। হঠাৎ মানচিত্রটা নিয়ে মা এলিজাবেথের সামনে গিয়ে বসে আলেকজান্ডার]

আলেকজান্ডার : মাদার। দিস ওয়ে, লুক। এই পথ ধরে লাভিভ হয়ে পোল্যান্ডের লুবিনে গিয়ে পৌঁছবো আমরা।

[এলিজাবেথ ঠায় বসে আছে। তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই।]

আলেকজান্ডার : প্লিজ মা প্লিজ। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। রুশ সৈন্যরা আবারো কিয়েভে মিসাইল ছুঁড়তে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন ধরে তাদের অভিযাত্রাও কিয়েভমুখী। প্রায় সবাই চলে গেছে শহর ছেড়ে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। ...আমরা তো আর চিড়দিনের জন্য যাচ্ছি না। যদিও সাধারণ জনগণ রুশ বাহিনীর লক্ষ্যবস্তু নয়, তবুও যুদ্ধতো যুদ্ধই।

এলিজাবেথ : তাহলে কেন অযথা সময় নষ্ট করছ আলেকজান্ডার? যাও। আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমার দেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি। আমি উদ্বাস্তু হতে পারব না। দ্যাটস ফাইনাল। ম্যাক্সিম, ইভান আর পিটারকে নিয়ে তোমরা রওনা হও।

[মায়ের কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় আলেকজান্ডার। ঠিক তখনি বোমার বিকট শব্দ। বুম্‌ম্‌ম্‌...। আশেপাশেই কোথাও বোমা পরেছে। শব্দে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। 'মা আ..' বলে চিৎকার করে ওঠে পিটার। এলিজাবেথ ছেলেকে বুকের মধ্যে গুঁজে নেয়। আলেকজান্ডার নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে অসুস্থ বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শব্দটা মিলিয়ে গেলে এলিজাবেথ বুকে ক্রুশ আঁকে। পরক্ষণেই রাগ-ক্ষোভ-ভয়-কান্না জড়ানো কণ্ঠে চিৎকার করে বলে ওঠে এলিজাবেথ]

এলিজাবেথ : ইভানটা গেল কোথায়?

আলেকজান্ডার : আর কোথায় যাবে! জাহান্নামে বোধ হয়।

[আলেকজান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বলে এলিজাবেথ]

এলিজাবেথ : ও আসলেই তোমরা রওনা হয়ে যেও। ... আচ্ছা একটা ফোন দাওনা ওকে।

আলেকজান্ডার : দিলাম তো! সুইচ অফ পাচ্ছি।

[ক্রিং ক্রিং। ক্রিং ক্রিং। কলিং বেলের আওয়াজ। ধক করে উঠল যেন প্রতিটি হৃদয়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সবাই যেন জমে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে আলেকজান্ডার দরজা খুলতে যাবে তার আগেই এলিজাবেথ হুড়মুড় করে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। ভিতরে ঢোকে ইভান। তার হাতে কাপড়ে মোড়ানো একটি বন্দুক।]

এলিজাবেথ : কোথায় ছিলে?

[ইভান কথার জবাব না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। উন্মত্ত চেহারা। চোখে যেন খুন ঝরছে। দেয়ালের সাথে বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখে। এরপর তার ব্যাগটা খুঁজতে থাকে। এলিজাবেথ আবার জিজ্ঞেস করে-]

এলিজাবেথ : কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

[ইভান বিরক্তির সাথে জবাব দেয়]

ইভান : জাহান্নামে! ...আমার ব্যাগটা কোথায়, এখানেই না ছিল?

[পাশের ঘর থেকে একটি ব্যাগ ও কিছু পোশাক নিয়ে ড্রইং রুমে ফেরে ইভান। এলিজাবেথ ইভানকে উদ্দেশ্য করে বলে-]

এলিজাবেথ : ম্যাক্সিম আর পিটারকে নিয়ে আলেকজান্ডারের সাথে তোরা চলে যা।

[ইভান তার ব্যাগে কিছু জামা কাপড় ঢুকাতে ঢুকাতে বলে-]

ইভান : তোমরা চলে যাও। আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি না।

[এদিকে আলেকজান্ডার ইভানের আনা কাপড়ে মোড়ানো বন্দুকটার কাছে যায়।

আলেকজান্ডার : কি এনেছো এটা? বন্দুক নাকি!

[কাপড়টা সরিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আর তিরস্কারের সুরে বলে-]

আলেকজান্ডার : পাখি মারার?

[বড় ভাইয়ের তিরস্কার যেন গুলির মতই বিদ্ধ হলো ইভানের গায়। সে ব্যাগ রেখে তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। প্রায় তেড়ে যায় আলেকজান্ডারের সামনে। বন্দুকটা আলেকজান্ডারের হাত থেকে হ্যাচকা টানে কেড়ে নিয়ে তিরস্কারের জবাবে বলে-]

ইভান : নব্য নাৎসী মারার।

[এলিজাবেথের মনে অন্য চিন্তা ভর করে। তার ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে!]

এলিজাবেথ : তুই যুদ্ধে যাবি!

ইভান : আরে, এত আশ্চর্য হবার কি আছে! সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে, আমি কেন বসে থাকব। আমি কি কাপুরুষ নাকি? (আলেকজান্ডারকে ইঙ্গিত করে বলে) আমি কাপুরুষও না। গাদ্দারও না।

[আলেকজান্ডার তিরস্কারের সুরে বলে-]

আলেকজান্ডার : ফ্রিডম ফাইটার! বীর মুক্তিযোদ্ধা!

[ইভানে কথা শুনে হতাশায় এলিজাবেথ ভেঙে পরে এলিজাবেথ। ধপ করে বসে পরে সোফায়। মাথায় হাত দিয়ে মাথা নিচু হয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে থাকে। এদিকে তুমুল তর্ক বেঁধে যায় দুই ভিন্ন পন্থী সহোদরের মধ্যে।]

ইভান : তোমার মতো কাপুরুষ নই। পুতিনের দালাল কোথাকার।

আলেকজান্ডার : মুখ সামলে কথা বলো ইভান।

ইভান : তুমি বরং পুতিনকে তার হাত সামলাতে বলো।

আলেকজান্ডার : জেলেনস্কি দেশকে নেটোর কাছে বিক্রি করে দিবে, শত্রুদের বাড়ির পেছনে ডেকে নিয়ে আসবে আর পুতিন বসে বসে আঙুল চুষবে।

ইভান : দেশটা কি পুতিনের বাপের নাকি! আর দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে মানে! ইউক্রেন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। নিজেদের সভ্রেন্টি রক্ষার খাতিরে যে কারো সাথে জোটবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, অধিকার ইউক্রেন রাখে। He has the freedom to choose anyone as a friend, anyone.

আলেকজান্ডার : হাউ স্টুপিড ইউ আর! হাউ স্টুপিড অল অফ ইউ! নেটোর সাথে জোট বাঁধার মানে বোঝো? নেটোর সাথে জোট বাঁধা মানে, ইউক্রেনে নেটো তথা ম্যারিকার সামরিক ঘাঁটি করে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া। খাল কেটে কুমির আনা।

পিটার : মাদা, মাদা! আই এ্যাম হাংরি।

[পিটারের ডাকে এলিজাবেথ মাথা তোলে। পরক্ষণেই তার মনে পরে সে ইভানকে খাবার আনতে পাঠিয়েছিল।]

এলিজাবেথ : ইভান তোমাকে না খাবার আনতে বলেছিলাম?

[ইভান পকেটে হাত দিয়ে একটি বার্গার বের করে।]

ইভান : কিছুই পাইনি। সব স্টল বন্ধ। জন কোত্থেকে যেন দু'টো বার্গার যোগাড় করেছিল। আমাকে একটা দিয়েছে।

[ইভান জ্যাকেটের পকেট থেকে বার্গারটা বের করে এলিজাবেথের হাতে তুলে দিয়ে আবার তর্কে লেগে যায়। এদিকে এলিজাবেথ বার্গারটা নিয়ে চাকু দিয়ে ৪ ভাগ করে কাটে। তিন ভাগ রেখে দিয়ে এক ভাগ পিটারকে খেতে দেয়।]

ইভান : ওহ, কি যেন বলছিলে? উম... ওহ, কুমির। কে কুমির আর কে বন্ধু সেই পাঠ তোমার কাছ থেকে নিতে হবে আমার?

আলেকজান্ডার : বন্ধু! বন্ধু বাছাইয়ে এত কাঁচা হলে চলে না ইভান। ম্যারিকা যার বন্ধু তার শত্রুর প্রয়োজন হয় না। এই কথাটা কে বোঝাবে জেলেনস্কিকে, কে বোঝাবে তোমাদের! ...শোনো ইভান, একটা স্টুপিড যখন দেশের প্রেসিডেন্ট হয় তখন জাতির ধ্বংস অনিবার্য। দেশ চালানো আর নাটক করা এক কথা নয়। এটা কোনো কমেডি নাটক না, এটা যুদ্ধ। নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখলাম। কতক্ষণ ভাঁড়ামো করে দর্শক হাসালাম-কাঁদালাম, দিনশেষে এক গাদা বাহ্‌বা নিয়ে বাসায় ফিরলাম- এত সোজা নয় ইভান।

ইভান : কাকে কি বলছ? যে মানুষটা দেশের জন্য নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন তার সম্বন্ধে তুমি এমন মন্তব্য করতে পারলে! তিনি তো তিউনেশিয়া, আফগানের প্রেসিডেন্টদের মত পালিয়েও যেতে পারতেন।

আলেকজান্ডার : ওরে আমার বীর রে..! জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। ওর বাইডেন বাবাকে ফোন না করলে আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো? এখন অস্ত্র হাতে নিয়ে কি লাভ! শুধু শুধু যুদ্ধটাকে দীর্ঘায়িত করা। আরো ক্ষয়ক্ষতি। আরো প্রাণ।

...কান খুলে শুনে রাখো ইভান, একমাত্র পুতিনই ইউক্রেনের রক্ষাকর্তা।

ইভান : হাউ ইন্টেলিজেন্ট ইউ আর! আই এম প্লিজড ব্রো! রিয়্যালি আই এম প্লিজড!

[মা এলিজাবেথকে শুনিয়ে বলে ইভান]

ইভান : মাদার, শুনেছ তোমার ছেলের কথা। তোমার বোদ্ধা ছেলের কথা। একটা রাক্ষসকে বলছে রক্ষাকর্তা। যে কিনা বোমা হাতে নিয়ে মাস্তানি করে বেড়ায়। প্রতিটা মুহূর্তে যে পরমাণু বোমা হামলার হুমকি দিয়ে পুরো মানবজাতিকে তটস্থ করে রেখেছে তাকে বলছে রক্ষাকর্তা। হাহ্‌! জোক অফ দ্যা সেঞ্চুরি ব্রো!

এলিজাবেথ : করো, ঝগড়া করো। যুদ্ধ করো। যা খুশি করো।

[রেগে পিটারকে নিয়ে উঠে ভিতরে চলে যায় এলিজাবেথ। মায়ের এভাবে চলে যাওয়ায় দুই ভাই একটু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরলেও পরক্ষণেই নিজেদের সামলে নিয়ে ফের তর্কে যোগ দেয়। আলেকজান্ডার পাইপ ধরায়।]

আলেকজান্ডার : ভুলে গেলে চলবে না ইভান, পরমাণু বোমার ব্যবহার কিন্তু সবার আগে করেছে তোমাদের বন্ধু ম্যারিকা।

[ক্ষিপ্র গতিতে প্রতি উত্তর দেয় ইভান]

ইভান : তো পুতিন সাহেব বুঝি পরমাণু বোমা ব্যবহারের জন্য এখন উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন! ম্যারিকা ব্যবহার করে ফেলল আর আমি এখনো করতে পারলাম না। আহ, কি আক্ষেপ!! তো পুতিন বাস্টার্ডকে বলো না কিয়েভে একটা পরমাণু বোমা ফেলতে। ঠিক এখানে। আমাদের মাথার উপরে। তারও এক্সপেরিমেন্ট হলো আর জাপানিদের মতো আমরাও একটু পরখ করে দেখলাম। বলো না তাকে, বলো! দাও, ফোন লাগাও!

আলেকজান্ডার : তুমি ভুলের মধ্যে আছো ইভান। অন্ধকারে আছো। সাম্রাজ্যবাদী ম্যারিকার হাত থেকে ইউক্রেনকে রক্ষার জন্য, এই অঞ্চলকে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য পুতিনের যা করা দরকার তা-ই করছে। এটা কোনো আগ্রাসন নয়। এটা রাশিয়ার সেল্ফ ডিফেন্স। ওদের মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ো না।

ইভান : ও রিয়্যালি! এটা আগ্রাসন নয়! অন্য একটি দেশের আবাসিক এলাকায় ক্ষেপনাস্ত্র হামলা, নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ, ভ্যাকুয়াম বোমা নিক্ষেপ, হাসপাতালে বোমা হামলা, কারাগারে বোমা হামলা, বেসামরিক মানুষ হত্যা, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরমাণু বোমা হামলার হুমকি– এগুলো আগ্রাসন নয়! তোমরা এখনো অন্ধের মতো রাশিয়াকে বিশ্বাস করো কিভাবে আলেকজান্ডার? ...সেভিয়েত কি এমনি এমনি ভেঙেছে? সোভিয়েত কি দিয়েছিল ইউক্রেনকে? পরাধীনতা আর শোষণ ছাড়া কি পেয়েছিল জনগণ? একটা স্বৈরাচারী শাষকগোষ্ঠীর সাফাই তোমরা কিভাবে গাইতে পারো? ...বাবা কি একসময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিলেন না? তিনি কি সোভিয়েতের হয়ে আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ করেন নি? সেই বিপ্লবী ব্যক্তিটি পরে নিজেই কেন সোভিয়েতের সাথে না থাকার পক্ষপাতি হয়ে উঠেছিলেন? ...কারণ তিনি স্বৈরশাসকদের শোষণে সর্বশান্ত হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র যে **'ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস'** এর গল্প করত সেটা যে আসলে **'হাবিয়া দোজখ'** তার সাক্ষী তো আমাদের বাবা নিজেই। তাকেই জিজ্ঞাসা করো, কেন তিনি সমাজতন্ত্রের

স্বর্গসুখ ছেড়ে, জন্মভূমি রাশিয়া থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এখানে।

আলেকজান্ডার : ইভান ওয়েইট ওয়েইট ওয়েইট। ভ্যাকুয়াম বোমা সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেছিল? ম্যারিকা। তোমাদের ম্যারিকাই ভিয়েতনাম আর আফগানিস্তানে এর ব্যবহার করেছিল প্রথম। ভুলে গেলে! ...আর বারবার যে, স্বৈরশাসন স্বৈরশাসন বলছ; গণতন্ত্রের কাছে তুমি কী আশা করো? গণতন্ত্র মানুষকে কী দিয়েছে? ভণ্ডামি, প্রতারণা, দারিদ্র্য, নোংরা পলিটিক্স, দলবাজি, হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাত– এ ছাড়া বিশ্বকে আর কি দিয়েছে গণতন্ত্র? ওহ, দিয়েছে তো। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা..! যার আশির্বাদে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। গণতন্ত্রের ফাঁকাবুলির উপর এতটা ভরসা আসে কিভাবে তোমাদের? ...যে ম্যারিকা পুরো আফগানিস্তান মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। লিবিয়া ধ্বংস করে দিল। সিরিয়ার এই অবস্থা করল। সাত সাগর তের নদী পার হয়ে গিয়ে ইরাক আক্রমণ করল, ১০ লক্ষ মানুষ হত্যা করল। আর তারপর হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতো বলল- **'আমাদের তদন্তে ভুল ছিল।'** ইরাকে কোনো ম্যাস ডেস্ট্রাকটিভ ওয়েপন পাওয়া যায় নি। কি বেহায়া! কি বেহায়া!! সেই ম্যারিকাই কি না আবার রাশিয়াকে এই এমবার্গো দিচ্ছে, সেই স্যাঙ্কশান দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক আদলতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার হুমকি দিচ্ছে। কি হাস্যকর! আরে, রাশিয়াকে ১০ টা নিষেধাজ্ঞা দিলেতো ম্যারিকার প্রাপ্য ১০০টা। ...লুহানেস্ক আর দোনেস্কের রুশ ভাষাভাষীদের কেমন চোখে দেখে ইউক্রেনীয় প্রশাসন কোনো ধারণা আছে তোমার? সেখানকার ব্যবসা কি আমি আর বাবা এমনি এমনি ক্লোজ করেছিলাম! ক্লোজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তুমি কিছুই জানোনা ইভান কিছুই জানোনা, কিছুই দেখনি। You know nothing.

ইভান : তাই বলে যুদ্ধ চাপিয়ে দিবে? এখন রাশিয়ার এই আগ্রাসন যে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে এর দায়ভার কে নিবে?

আলেকজান্ডার : বিশ্বযুদ্ধের কথা যদি এসে থাকে তাহলে এর সূত্রপাত ঘটিয়েছে তোমাদের ঐ জোকারটা। তার বাইডেন বাপকে করা একটা ফোনই বিশ্বকে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তার এই বোকামিই বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছে। বোকামি বালাটা বোধ হয়

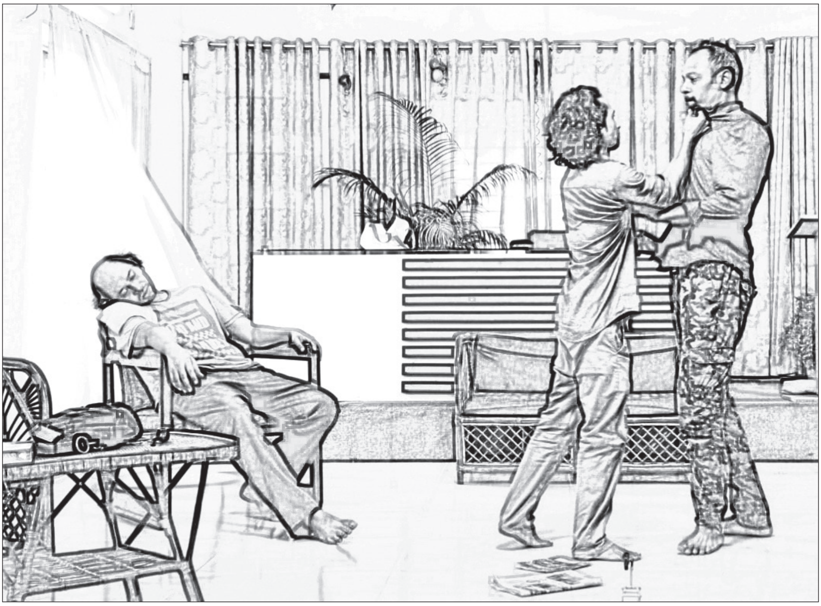

ভুল হচ্ছে আমার। Maybe Cunningness. পূর্ব পরিকল্পিত, Master Plan. বিশ্বাস করি কি করে! After all he is a Jewish breed.

[এই সময় কাছেই কোথাও বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দ। সবাই কানে হাত দিয়ে বসে পড়ে। পরক্ষণেই ইভান লাফ দিয়ে ওঠে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে পুতিনকে গালাগাল দিতে থাকে। চোখ পরে আলেকজান্ডারের টেবিলে রাখা পুতিনের ছবিটির দিকে। তেড়ে যায় সেদিকে।]

ইভান : ইউ পুতিন। বাস্টার্ড। সান অফ বিচ।

[টেবিলে রাখা পুতিনের পোট্রেটটি আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলে ইভান। পা দিয়ে একটার পর একটা লাথি মারতে থাকে আর বলতে থাকে-]

ইভান : আমার ঘরে ফ্যাসিস্ট রাক্ষসের ছবি থাকবে কেন?"

[এ ঘটনায় আলেকজান্ডারও ক্ষেপে যায়। কন্ট্রোল হারায় সেও। রেগে গিয়ে সে দেয়ালে টানানো ভ্লাদিমির জেলেনস্কির পোট্রেটটা নামিয়ে ভেঙে ফেলে।

আলেকজান্ডার : আমার ঘরে ইসরাইলের কোনো দালালের ছবিও থাকবে না।

[ইভান এবার আলেকজান্ডারের উপর চড়াও হয়। সে ঝাঁপিয়ে পরে আলেকজান্ডারের উপর।]

ইভান : গাদ্দার। Traitor. Hypocrite.

[দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। চোখের সামনে দুই ভাইকে মারামারি করতে দেখে গোঙানি শুরু হয় বাবা ম্যাক্সিমের। সে আরো কাঁপতে থাকে। কিছু বলতে চায়। ধমক দিয়ে থামাতে চায় ছেলেদের। কিন্তু সে শক্তি তার নেই। কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে যায় মেঝেতে। উত্তেজনায় দুই ভাইয়ের কেউই খেয়াল করে না। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে আলেকজান্ডারের ধাক্কায় ছিটকে পরে ইভান। শরীরের কোথাও চোট পায়। চোটটা একটু সামলে নিয়েই সে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে আলেকজান্ডারের দিকে তাক করে। এসময় চিৎকার করে স্টপ স্টপ বলে রুমে ঢোকে এলিজাবেথ। ঢুকেই দেখে ম্যাক্সিম পরে আছে মেঝেতে। দৌড়ে ম্যাক্সিমের কাছে যায় এলিজাবেথ। এতক্ষণে দুই ভাইয়ের নজরে আসে বাবা ম্যাক্সিম পরে আছে। আলেকজান্ডারও গিয়ে টেনে তোলে বাবাকে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে এলিজাবেথ গিয়ে ইভানের গালে একটি চড় বসিয়ে দেয়। ঠিক এই মুহূর্তে কলিং বেল বেজে ওঠে। সবাই দরজার দিকে তাকায়। ...বন্দুকটা তুলে নিয়ে সোফার আড়ালে রাখে ইভান। একটি চেয়ার টেনে বসে পরে সে। আলেকজান্ডার বাবার পরিচর্যায় ব্যস্ত। এলিজাবেথ গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। প্রবেশ করে বাংলাদেশ থেকে স্কলারশিপ পেয়ে ইউক্রেনে পড়তে আসা এক স্টুডেন্ট সামিরা। ইভানের ফ্রেন্ড। ম্যাক্সিম পরিবারের সাথে বেশ সখ্য গড়ে উঠেছে তার। দরজা খুলে দিলে সামিরা ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে-]

সামিরা : ইয়া আল্লাহ! আপনারা এখনো যান নি! আমি তো ভাবিই নি আপনাদের এসে পাবো।

[চেয়ারে বসতে বসতে সামিরা বলে-]

সামিরা : যাই হোক, একটা শুভ সংবাদ আছে- শুনলাম, রুশ বাহিনী নাকি পিছু হটেছে। ইউক্রেন বাহিনী নাকি তাদের তাড়িয়ে একদম কিয়েভের বাইরে নিয়ে গেছে।

[কথাটা শুনে এলিজাবেথ সস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে]

এলিজাবেথ : তাই নাকি! ওহ, থ্যাংকস গড!

[এতক্ষণে যেন ঘরের রণক্ষেত্র অবস্থা চোখে পরে সামিরার।]

সামিরা : এখানে কি হচ্ছে? কোনো সমস্যা?

এলিজাবেথ : যুদ্ধে সমস্যা বলতে কিছু নেই। এখন সবই সম্ভব। তুমি না এম্বাসিতে গিয়েছিলে?

সামিরা : যেতে আর পারলাম কই? শুনলাম ইন্ডিয়ার এম্বাসির পাশেই কোথাও বোমা পড়েছে। কয়েকজন স্টুডেন্ট নাকি হতাহত হয়েছে। তার মধ্যে নাকি ২ জন বাংলাদেশি। তুহিনের তো

এম্বাসিতে ওয়েইট করার কথা ছিল। ওকে ফোনেও পাচ্ছি না। চিন্তা হচ্ছে খুব। কোনো দুর্ঘটনা হলো কি না! বাংলাদেশের এম্বাসি থাকলে এত সমস্যা হত না। আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য মহাবিপদ হয়ে গেল।

আলেকজান্ডার : ওহ্ স্যাড!

ইভান : স্যাড! লজ্জা করে না! নির্দোষ মানুষগুলোকে হত্যা করছ, আবার বলছ স্যাড।

আলেকজান্ডার : যুদ্ধে এতটুকু হয়েই থাকে। এটা কলেটোরাল ড্যামেজ, আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি।

সামিরা : হ্যাঁ, কলেটোরাল ড্যামেজ! ইরাকে ১০ লক্ষ বেসামরিক মানুষ হত্যার পর ঠিক এই শব্দটাই ব্যবহার করেছিল জর্জ ডব্লিউ বুশ। আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি। শক্তি পরীক্ষা করবে তারা। আর নির্দোষ সাধারণ মানুষের প্রাণগুলো আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকাভুক্ত হবে।

[দুই ভাইকে উদ্দেশ্য করে]

সামিরা : তোমরা কি ঝগড়া করছিলে নাকি?

[রুমের চারিদিকে তাকিয়ে চোখ বুলিয়ে]

সামিরা : তোমরা তো কিছুই গোছগাছ করো নি।

এলিজাবেথ : বাইরে আর কী যুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধতো হচ্ছে আমার ঘরে।

[দুই ভাইকে ইঙ্গিত করে বলে]

এলিজাবেথ : ইনি রাশিয়ার মুখপাত্র আর ইনি ম্যারিকার।

[সামিরা হেসে ফেলে।]

সামিরা : কারো সাফাই গেয়ে লাভ নেই আর কোনো একজনকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। কেউই ধোয়া তুলসি পাতা নয়। রাশিয়া আর অ্যামেরিকা কয়েক দশক ধরে একে অপরের দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। কতদিন আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব। একজনকে না একজনকে ট্রিগার চাপতেই হবে। এটাই বাস্তবতা। দরকার ছিল শুধু একটা ইস্যুর।

আলেকজান্ডার : এক্স্যাক্টলি। ইস্যুটা সৃষ্টি করল কে সামিরা?

সামিরা : ইস্যু কে সৃষ্টি করল সেটা বড় কথা নয়। ইস্যু আজ হোক কাল হোক সৃষ্টি হতোই। ঘুরে ফিরে ভাদ্র মাসও আসত আর তালও পড়ত। এই যুদ্ধ হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার দু'হাতের কামাই। এটা হবারই ছিল। ইউক্রেনের যা করার ছিল ইউক্রেন সেটা করে নি। ইউক্রেন যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিত তাহলে তাকে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হতো না।

ইভান : ইউক্রেনের কি করা উচিত ছিল? নিজেদের স্বাধীনতা বাস্টার্ড পুতিনের হাতে তুলে দেয়া উচিত ছিল?

সামিরা : না। আমি তা বলছি না ইভান। ইউক্রেনের উচিত ছিল নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া, না অ্যামেরিকার না রাশিয়ার। নিজেরা যদি ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। তাহলে রাশিয়া বলো আর অ্যামেরিকা বলো কেউই ইউক্রেনের সাথে খবরদারি করতে পারত না। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনকে পরতে হতো না। রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা করার সাহসই পেত না। আর ইউক্রেনকেও অ্যামেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হত না।

এলিজাবেথ : ঠিকই বলেছ সামিরা। ওরা আমাদের গাছে উঠিয়ে মই সরিয়ে নিয়েছে। পাশে থাকার কথা বলে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে তারা এখন মজা দেখছে। অস্ত্রের ব্যবসা খুলে বসেছে।

[ইভান উঠে ভিতরের রুমে যায়]

সামিরা : তাদের ইকোনমিই হচ্ছে ওয়ার ইকোনমি। যুদ্ধ না হলে তাদের সংসার চলে না। অস্ত্র ব্যবসা তাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। একটি বিষয় কি লক্ষ করেছেন? যুদ্ধ পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন অ্যামেরিকা-রাশিয়া তাদের ফসল ঠিক ঠিক তুলে নেয়। যুদ্ধ মানেই অ্যামেরিকা-রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবসা চাঙা। ব্যাপারটা অনেকটা এমন, তারা যেন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ চাষ করে চলে আর ঘুরে ঘুরে ফসল তুলে বেড়ায়।

এলিজাবেথ : হুম। ইউক্রেন এখন তাদের ফাঁদে পরা বগা। কিন্তু এখন আমাদের আসলে কি করা উচিত?

আলেকজান্ডার : তোমরা কথা বলো। আমি সব গোছগাছ করি।

[আলেকজান্ডার চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরে চলে যায়]

সামিরা : সত্যি বলতে, ইউক্রেনের এখন আসলে কিছুই করার নেই। এখন পরিণতি ভোগ করার পালা। পরিণতি থেকে কেউ পালাতে পারে না। পরিণতি কাউকে এতটুকু ছাড় দেয় না। পরিণতি সর্বদা নির্মম, বিভৎস্য চেহারা নিয়ে হাজির হয়।

[একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সামিরা]

সামিরা : বাংলাদেশকে নিয়েও ভয় হচ্ছে খুব জানেন? রাজনীতির নামে দলাদলিতে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশটা। ক্ষমতার জন্য এহেন হীন কাজ নেই যা করতে পারে না রাজনীতিবিদরা। ক্ষমতার লোভে দেশটাকে শিয়ালের কাছে বর্গা দিতেও তাদের উৎসাহের কমতি দেখা যায় না। কিছু হলেই তাদের প্রভুদের কাছে গিয়ে নালিশ দেয়। আসেন। দ্যাখেন। এই হইছে রে, সেই হইছে রে, এই করছে রে, সেই করছে রে। ...অন্যদিকে, ধর্মের নামে চলছে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ আর অপরাজনীতি। ধর্মের দোহাই দিয়ে কিছুদিন পর পর একেকটা ইস্যু তৈরি করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়। ...ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শোষণের পর শুরু হয় পাকিস্তানিদের শোষণ। পাকিস্তানিদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার পর একটা দিনের জন্যও দেশটাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি কেউ। সোনার দেশটাকে মনে হয় ইরাক-সিরিয়া না বানিয়ে ক্ষান্ত হবে না তারা। ...খুব আফসোস হয় জানেন, তারা যদি বুঝতো এর পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে!

[এই সময় ইভান পিটারকে নিয়ে প্রবেশ করে। পিটার চোখ ডলতে ডলতে ঢোকে। পিটারকে দেখে সামিরা হাই দেয়।]

সামিরা : হেই পিটা। হাউ আর ইউ? আই হ্যাভ সামথিং ফর ইউ।

[এই বলে সে তাকে কাছে টেনে নেয়। পকেট থেকে একটি চকলেটের প্যাকেট বের করে তার হাতে দেয়। পিটার চকলেট হাতে নিয়ে মায়ের কোলে গিয়ে বসে।]

এলিজাবেথ : কিছুদিন পর পর তাইওয়ান নিয়েও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখা যায়।

[সামিরা এলিজাবেথের মুখ থেকে এক প্রকার কথা টেনে নিয়ে যায়]

সামিরা : হ্যাঁ, তাইওয়ান নিয়ে সম্ভবত শুরু হতে যাচ্ছে নতুন খেলা। এখানে মেতেছে চীন। আর অ্যামেরিকা তো সবখানে কমন। এদিকে, মিয়ানমার পায়ে পারা দিয়ে যুদ্ধ বাজাতে চাচ্ছে বাংলাদেশের সাথে। এমনিতেই বিশ্ব পরিস্থিতি টালমাটাল।

অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পরছে। আমাদের বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো আগুনের উপর দিয়ে হাঁটছে। শ্রীলঙ্কা মুখ থুবরে পরে গেল। এসবে আমেরিকা, চীন, রাশিয়ার মত রাঘব বোয়ালদের কিচ্ছু যায় আসে না। ...রাজনৈতিক হোক, অর্থনৈতিক হোক আর ভৌগলিক বিবেচনায়ই হোক– রাশিয়া চাইবে ইউক্রেন দখল করতে, চীন চাইবে তাইওয়ান দখল করতে আবার কেউ হয়ত চাইবে বাংলাদেশ দখল করতে। আল্লাই ভালো জানেন এরকম পরিস্থিতিতে পরলে আমাদের কি হবে!

এলিজাবেথ : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তাহলে শুরুই হয়ে গেল নাকি?

[একটু মুচকি হাসে সামিরা]

সামিরা : অনেক আগেই। এখন কবে শেষ হবে, কি পরিণতি নিয়ে শেষ হবে সেটাই দেখার বিষয়। বাইডেন তো নিজ মুখেই বললেন যে, রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা মানে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুনিশ্চিত। আর ভিতরে ভিতরে কিন্তু দলও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মত ২টা পক্ষ হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি। যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করছে তারা তাদের এই নিরপেক্ষ অবস্থান কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে সেটাও দেখার বিষয়। যুদ্ধ আসলে কেউ চায় না, কিন্তু যুদ্ধে সবাই পরে যায়। পরিস্থিতি চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যায়। তখন আসলে কিছুই করার থাকে না।

[কথা পুরোপুরি শেষ না হতেই ইভানদের ভবনে এ বোমা পরে। বিকট শব্দ। লাইট অফ। পর পর কয়েকটি বোমার শব্দ। মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তাদের বাসা। ধোয়ায় আচ্ছন্ন। সবার মৃতদেহ পরে আছে। একেজনের মৃতদেহ একেকভাবে পরে আছে। টেবিল-চেয়ারসহ ঘরের সব আসবাবপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারো মৃতদেহ টেবিলের নিচে। কারো মৃতদেহ চেয়ারের নিচে। এলিজাবেথ পিটারকে জাড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে গুঁজে মরে পরে আছে। কোত্থেকে ভেসে আসা মাতমের মত করুণ একটা সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মাঠ-ঘাট, দিক-দিগন্ত ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়।]

'I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones' *-Albert Einstein.*

-সমাপ্ত-

ভালো হয়ে যা মাসুদ

দৃশ্য-১

বাহির-দিন-রাস্তা-পার্ক (মাসুদ ও তার বন্ধুরা)

[আহমেদ পারভেজ মাসুদ। একজন সুষম যুবক। সুষম যুবক বলিবার হেতু এই যে, সে নিষ্কলুস জীবনযাপনে বিশ্বাসী। অতিশয় নম্র ও ভদ্র প্রকৃতির। তাহার দ্বারা জীবনে কারো কোনো ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এমন উদাহরণ কশ্মিনকালেও কেউ দেখাইতে পারিবে না। বরং তাহার মারফত অনেকেই উপকৃত হইয়া থাকে। নানা সময়ে নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। সে "গ্রিন ফ্রেন্ডহুড" সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য। "গ্রিন ফ্রেন্ডহুড" আহমেদ পারভেজের বন্ধুমহল কেন্দ্রিক একটি সংঘ। আজকে এই সংঘ কর্তৃক একটি বিচারিক সভা ডাকা হইয়াছে। আহমেদ পারভেজ তাহার জন্যই হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতেছে।]

[আহমেদ পারভেজ বাসা থেকে বের হয়ে গলি পথ ধরে হাঁটছে। পথে এক (ইটের টুকরো দিয়ে লাল রঙে লেখা) দেয়াল লিখনে তার চোখ আটকে যায় - "ভালো হয়ে যা মাসুদ"। তার চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে। এদিকে মাসুদের বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার অবস্থান জানার জন্য তার এক বন্ধু জুনায়েদ তাকে ফোন দেয়]

জুনায়েদ : এই তুই কই?

মাসুদ : এইতো চলে আসছি। আর ২ মিনিট।

জুনায়েদ : তাড়াতাড়ি আয়।

মাসুদ : এইতো চলে আসছি।

['গ্রিন ফ্রেন্ডহুড' বন্ধুমহলে শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাসুদ এই সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য। গ্রিন ফ্রেন্ডহুডের সদস্যদের কিছু আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। একই আইন কেউ ২ বার ভঙ্গ করলে দণ্ডের পাশাপাশি তাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয়। কেউ ৩বার ভঙ্গ করলে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়ে সংঘ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। আইনসমূহের মধ্যে একটি হল- বিয়ের আগে গ্রিন ফ্রেন্ডহুডের কোনো সদস্য প্রেম করতে পারবে না।

বিচারের নিয়ম: ***কেউ আইন ভঙ্গ করিলে সঙ্ঘের ৩ সদস্যকে নিয়ে জুড়ি বোর্ড গঠন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার বিবেচনাপূর্বক অভিযুক্তকে দণ্ডিত করা হইবে। যাহা মানিয়া লইতে অভিযুক্ত বাধ্য থাকিবে। দণ্ড মানিতে নারাজি জানাইলে তাহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করার বিধান রহিয়াছে। এবং সকল সদস্য তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে।***

বন্ধুমহলের একজনের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রমাণও মিলেছে। তার বিচার করার উদ্দেশ্যে গ্রিন ফ্রেন্ডহুড আজ সভা আহ্বান করেছে। সভায় ৩ সদস্য বিশিষ্ট জুড়ি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে জুড়ি বোর্ডের তিন সদস্য মিলে অভিযুক্তকে দণ্ড প্রদান করবে। অভিযুক্ত সজিব কাচুমাচু মুখ নিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে। মাসুদ সভায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করে।]

মাসুদ : সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইল যে গ্রিন ফ্রেন্ডহুড়ের সদস্য মো. সজিব হোসেন গ্রিন ফ্রেন্ডহুড়ের সাংবিধানিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে। সে একাধারে গ্রিন ফ্রেন্ডহুড এর 'উন্মত্ত' কার্যবিধি ২০১৮ এর তিন তিনটি ধারা লঙ্ঘন করিয়াছে।

অভিযোগ ১- সে বিবাহের পূর্বে প্রেমের সম্পর্কে জড়াইয়াছে।

অভিযোগ ২- সে একই অপরাধ দ্বীতিয়বার করিয়াছে।

অভিযোগ ৩- সে দশম শ্রেণিতে পড়া অপ্রাপ্ত বয়স্কা এক নাবালিকার সাথে প্রেমে জড়াইয়াছে।

তদন্ত ও সাক্ষের ভিত্তিতে আদালত অভিযোগের সত্যতা পাইয়াছে। বিচারের রায় প্রদানের পূর্বে জুড়িবোর্ডের তিন সদস্য মিলিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার লক্ষ্যে সকলের কাছ থেকে কয়েক মিনিট চাহিয়া লইলাম।

[এই বলে জুড়ি বোর্ডের তিন সদস্য, মাসুদ, অনিক ও জুনায়েদ উঠে একটু দূরে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে আবার বিচার সভায় এসে বসে রায় প্রদান করে]

জুনায়েদ : যেহেতু সে একই অপরাধ পর পর দুইবার করিয়াছে সেহেতু বিধান মতে মো. সজিব হোসেনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে শেষবারের মত সতর্ক করা হইল।

[পকেট থেকে বের করে তাহাকে একটি হলুদ কার্ড দেখানো হয়। এসময় অন্য সকলে হাত তালি দিয়ে রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে]

জুনায়েদ : এবং গ্রিন ফ্রেন্ডহুড সঙ্ঘের সদস্যদের জন্য মিন্টু মামার দোকানে আগামী ৭ আড্ডা দিবসের নাস্তার বিল সে নিজে বহন করিবে এই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

সজিব : এইটা কি মামা! সবার বেলায় ৪ দিন আমার বেলায় ১ সপ্তাহ ক্যান মামা। এটাতো ন্যায় বিচার হইল না মামা।

মাসুদ : তুমি যে এক অপরাধ দুই দুইবার করিয়াছো তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছো? সে অনুযায়ী তোমার অর্থদণ্ডের জন্য ৮ আড্ডাদিবস ধার্য করা উচিতকার্য ছিল। তোমার প্রতি বরং দয়াই দেখাইয়াছে আদালত। ১ আড্ডাদিবস মওকুফ করা হইয়াছে। তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকো। ...এই পড়।

অনিক : সে যদি একই অপরাধ তৃতীয়বারও করিয়া থাকে তাহলে তাহাকে লাল কার্ড প্রদর্শন করিয়া আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হইবে। ...অপ্রাপ্ত বয়স্ক এক কিশোরীকে তাহার প্রেমের ফাঁদে ফালাইবার অপরাধে তাহাকে শার্ট খুলিয়া খালি গা হইয়া ঐ কিশোরীর বাড়ির সামনে রাস্তায় দৌড়াইয়া ৭ বার রাউন্ড দিতে হইবে।

[সজিব এবার ক্ষেপে যায়।]

সজিব : এই বিচার উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এখানে ইচ্ছে করে আমাকে ছোট করা হচ্ছে।

[একজন সজিবের হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে দেয়।]

মাসুদ : একদম ফালাফালি করবা না। ছোট কাজ করতে পারবা আর শাস্তি দিলে মানতে পারবা না তা তো হবে না। যখন করছিলা তখন মনে ছিল না? আদালতকে অসম্মান করবা না। আর একবার যদি তুমি আদালতকে অসম্মান করছ তো ধারা ৩ লঙ্ঘণের অপরাধে অভিযুক্ত হবা।

[এই কথা শুনে সজিব চুপসে যায়]

অনিক : আচ্ছা ঠিক আছে। বিষয়টা কিঞ্চিত সভ্যতা বিবর্জিত। স্যান্ডো গেঞ্জি পরতে পারবে।

[সজিব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে মাসুদ বলে]

মাসুদ : আর একটা কথাও বলা যাবে না। স্যান্ডো গ্যাঞ্জিই সই।

জুনায়েদ : এবং এই মেয়ের সাথে সে আর কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখিবে না। নো কলিং, নো চ্যাটিং, নো ডেটিং।

দৃশ্য-২

বাহির-দিন-রাস্তা (মাসুদ ও তার বন্ধুরা, সজিব ও তার প্রেমিকা, প্রেমিকার ছোট ভাই)

[সজিব তার প্রেমিকার বাসার সামনে দিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে রাউন্ড দেয়। মাসুদরা তার রাউন্ড গুণছে। ১, ২, ৩............৭। সজিবের প্রেমিকা বারান্দায় এসে তার অবস্থা দেখে রেগে আবার ভিতরে চলে যায়। সে সজিবের নাম্বারে ফোন দেয় আর সজিব বারবার ফোন কেটে দেয়। সে রেগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। এমন সময় তার ছোট ভাই এসে তাকে বলে]

তনু : আপু দ্যাখো একটা পাগল আমাদের বাসার সামনে খালি গায়ে দৌড়াচ্ছে।

[সজিবের প্রেমিকা আরো ক্ষেপে যায়। ছোট ভাইকে ধমক দেয়।]

আপু : এই যা এখান থেকে।

দৃশ্য-৩

বাহির-দিন-চায়ের দোকান (মাসুদ ও তার বন্ধুরা)

[দৌড় পর্ব শেষ করে সবাই মিলে মিন্টুর চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সজিব এখনো মৃদু হাঁপাচ্ছে। বিধান মতে আড্ডার বিল সব সজিবের। যে যা পারছে খাচ্ছে। জুনায়েদকে একটা বেনসন সিগারেটের অর্ডার করতে দেখে সজিব ক্ষেপে যায়]

সজিব : এগুলো কি?

[অন্যদের দিকে তাকিয়ে তাদের সমর্থন চেয়ে বলে]

সজিব : এটাতো মানবো না মামা। সে সবসময় খায় গোল্ডলিফ। আজকে বেনসন কেন?

জুনায়েদ : আরে ভাই একটা মানুষ ব্র্যান্ড চেঞ্জ করতে পারে না!

সজিব : তুই কখন ব্র্যান্ড চেঞ্জ করলি?

জুনায়েদ : গতকালকে করছি। গতকাল থেকে বেনসন ধরছি। তোর কোনো সমস্যা আছে?

[সজিব চায়ের দোকানদার মিন্টুকে লক্ষ করে প্রশ্ন করে]

সজিব : এই মিন্টু মামা ও কালকে তোমার কাছ থেকে বেনসন নিছে না গোল্ডলিফ নিছে?

মিন্টু মামা : আমারতো মনে নাই।

সজিব : মনে নেই মানে!

জুনায়েদ : আরে সে দোকানদার, তার সবকিছু মনে রাখা সম্ভব নাকি?

মাসুদ : আচ্ছা হইছে। তুই ব্র্যান্ড চেঞ্জ করছ তা কেউ জানে না। আড্ডায় তুই বেনসন খাইলে অতিরিক্ত বিল তুই বহন করবি।

[জুনায়েদ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তাকে মাসুদ থামিয়ে দিয়ে বলে]

মাসুদ : আর কোনো কথা না।

[সজিব নিজ মনে বলতে থাকে]

সজিব : অইসাই সে ৩টা কলা খাইছে। ৩টা বিস্কুট খাইছে। মনে হচ্ছে বাসা থেকে ইচ্ছে করে কিছু না খেয়ে বের হয়েছে।

[পাশে আরেকজন চায়ের মধ্যে কলা ভিজিয়ে খাচ্ছে। দেখে সজিব আরো রেগে যায়]

সজিব : এই মিন্টু মামা। ওরে আরো চারকাপ চা দাও। আর এক হালি কলা দাও।

[শুনে সবাই হেসে ফেলে।]

দৃশ্য-৪

ভিতর-দিন-বাসা (মাসুদ ও মাসুদের মা)

[আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই পড়ছে মাসুদ। আর গুণগুণ করে গান গাচ্ছে। অফিস যাবে। মাসুদের মা টিফিন ক্যারিয়ার ডায়নিং টেবিলে রাখে।]

মাসুদের মা : টিফিন ক্যারিয়ার নিতে ভুলিস না।

মাসুদ : ভুলবো না।

মাসুদের মা : ফেরার সময় ২ কেজি বাটালি গুড় নিয়ে আসিস।

মাসুদ : আচ্ছা।

[টাই লাগিয়ে চুলটুল ঠিক করে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে বেরিয়ে যায় সে। দরজা লাগিয়ে দিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ আরো একটা বিষয় মনে পড়ায় আবার ডাকে মাসুদকে]

মা : আচ্ছা শোন।

মাসুদ : আবার কি!

মা : আগামী কালকে একটু ছুটি নিতে পারবি?

মাসুদ : কেন?

মা : তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

মাসুদ : কোথায়।

মা : এখন বলব না।

মাসুদ : আচ্ছা দেখি।

[এই বলে সে সিড়ি ভেঙে নামতে থাকে। মা দরজা লাগিয়ে দেয়]

দৃশ্য-৫

বাহির-দিন-বাসার গ্যারেজ (মাসুদ ও এক ভাড়াটিয়া)

[(মাসুদের একটি বাইক আছে। সে বাইকে করে অফিস যায়) গ্যারেজ থেকে তার বাইক বের করে মাসুদ। দেখা হয় তাদের বাসার ভাড়াটিয়া এক মুরব্বির সাথে]

মাসুদ : স্লামালেকুম কাকা। কেমন আছেন?

কাকা : অলাইকুম সালাম। এইতো ভালো। তোমার মা কেমন আছে?

মাসুদ : ভালো কাকা।

কাকা : তোমার মাকে বলো, জসিম এ মাসে টাকা পাঠাতে পারেনি। সামনের মাসে একসাথে দিব।

মাসুদ : আচ্ছা কাকা। সমস্যা নাই। ঠিক আছে, গেলাম কাকা।

কাকা : আচ্ছা যাও।

মাসুদ : স্লামালেকুম।

কাকা : অলাইকুম সালাম।

[বাইক টান দেয় মাসুদ]

দৃশ্য-৬

বাহির-দিন-মোটরসাইকেল গ্যারেজ (মাসুদ, ছোটন ও জনৈক ব্যক্তি)

[মা-বাবা হারা ছোটন। ইয়াতিম। একসময় শারীরিক প্রতিবন্ধী সাজিয়া রাস্তায় রাস্তায় গান গাইয়া ভিক্ষা করিত আর সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া বেরাইতো। ভিক্ষা কম পাইলে চুরি করিত নাকি চুরির সুযোগ খুঁজিতে ভিক্ষা করিত তাহা নিশ্চিত করিয়া কেউ বলিতে পারে না। একবার পারভেজদের বাসার এক ভাড়াটিয়ার বাড়িতে চুরি করিতে যাইয়া ধরা পরিবার পর তাহাকে ধরিয়া গ্যারেজের কাজে লাগাইয়া দেয় মাসুদ। ভর্তি করাইয়া দেয় একটা রাত্রীকালীন পাঠ্যালয়ে।]

[বাইক নিয়ে ছোটনের গ্যারেজের সামনে দাঁড়ায় মাসুদ। ছোটন একটি বাইকের চাকায় হাওয়া দিচ্ছিল। মাসুদকে দেখেই সে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। একটা টুল এনে বসতে দেয়।]

ছোটন : স্লামালাইকুম ভাই।

মাসুদ : কিরে কেমন আছিস?

ছোটন : ভালো ভাই।

মাসুদ : তোর পরীক্ষা শুরু কবে?

ছোটন : ২২ তারিখ ভাই।

মাসুদ : ওহ। তাহলে তো আরো কয়েকদিন বাকি আছে। পড়াশুনা হচ্ছে তো?

ছোটন : জি ভাই। ভাই চা দেই?

মাসুদ : না, হাওয়া দে। পেছনের চাকাটায় একটু হাওয়া দে। আর ক্লাস টা একটু দেখে দে।

ছোটন : দ্যাখতাছি ভাই।

[ছোটন তার বাইক নিয়ে কাজে লেগে পড়ে।]

[গ্যারেজের পাশে রাস্তায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। সে সম্ভবত রাইডার খুঁজছে–তার ভাবভঙ্গিতে এমনটাই প্রকাশ পাচ্ছে। মাসুদ লক্ষ করে লোকটিকে।]

মাসুদ : আপনি কি রাইডার খুঁজছেন?

জনৈক ব্যক্তি : জি।

মাসুদ : কোথায় যাবেন?

জনৈক ব্যক্তি : গুলশান

মাসুদ : আমিও ঐদিকেই যাবো।

জনৈক ব্যক্তি : কত দিতে হবে?

মাসুদ : টাকা দিতে হবে না। লিফট দিচ্ছি।

[ছোটনকে তাগাদা দিয়ে মাসুদ বলে]

মাসুদ : কিরে, কতদূর?

ছোটন : এইতো ভাই। ক্লিয়ার।

[মাসুদ বাইকে চড়ে বসে। জনৈক ব্যক্তি একটু ইতস্তত করছে দেখে মাসুদ বলে]

মাসুদ : কি ভাবছেন? আরে ভাই আসেন। আমি প্রায় প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে লিফট দেই।

[বাইক স্টার্ট দিয়ে টান দেয় মাসুদ]

দৃশ্য-৭

বাহির-দিন-পার্ক (মাসুদ ও তার বন্ধু রমিজ)

[রমিজ একটি জায়গায় মাথা নিচু করে বসে আছে। তার চেহারায় হতাশা-বিষণ্নতা। মাসুদ বাইক থামিয়ে এসে তার পাশে বসে]

মাসুদ : কিরে কি হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে? কেঁদে ফেলবি মনে হচ্ছে!

রমিজ : পুরুষ মানুষ না হলে কেঁদেই ফেলতাম।

মাসুদ : কি হইছে?

রমিজ : আমার হাজার ত্রিশেক টাকা লাগবে। বাবা খুব অসুস্থ।

মাসুদ : ত্রিশ হাজার!

রমিজ : এক জায়গা থেকে টাকা পাবার কথা ছিল। সকালে জানালো টাকাটা দিতে পারতেছে না।

মাসুদ : কবে লাগবে?

রমিজ : আজকে হলেই ভালো হয়। কালকে হলেও চলবে।

মাসুদ : টেনশন করিস না। আমি দেখতেছি।

[একটু নীরবতা]

মাসুদ : তুই দ্যাখ হাজার দশেক জোগাড় করতে পারো কি না। আমিতো চেষ্টা করবই। তারপরেও তুই হাজার দশেকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা কর।

রমিজ : আচ্ছা দেখি।

দৃশ্য-৮

বাহির-দিন-পার্ক (মাসুদ, আখি, সজিব ও জুনায়েদ)

[গ্রিন ফ্রেন্ডহুড এর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত পারভেজ প্রেম করে নি তার মানে এই নয় যে, তার নারী ফোবিয়া আছে। তার মা যেদিন প্রথম তাকে বিয়ের তাগিদ দিয়েছিলেন সে দিনই সে ভার্টিক্যালি মাথা ঝাকিয়ে তার সম্মতি জানিয়ে দেয়। যথাসময়ে মেয়ে দেখাও শুরু হয়।

২টি পাত্রীকে রিজেক্ট করার পর একটা মেয়ের সাথে তার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে ওঠে। মেয়েটি পারভেজের সাথে একান্ত আলাপ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে একদিন তারা পার্কে দেখা করে। একজনের সাথে আরেকজন একটু ভালোভাবে পরিচিত হবার নিমিত্তে তারা যখন পাশাপাশি বসে কথা বলছিল তখনই গোলটা বাঁধে-]

মাসুদ : আপনার প্রিয় কালার কি?

আখি : সাদা-কালো।

মাসুদ : আপনি কি পশু?

আখি : মানে!

মাসুদ : না মানে, ভাবলাম আপনি বোধহয় কালার ব্লাইন্ড! এত কালার থাকতে পছন্দের কালার সাদা-কালো!

[আখি কথা শুনে হেসে ফেলে]

আখি : আপনার প্রিয় কালার কি?

মাসুদ : ডিজকালার।

আখি : মানে!

মাসুদ : ধুসর!

আখি : আপনি তো খুব মজা করে কথা বলেন!

মাসুদ : তাই নাকি?

আখি : কেন আপনাকে আগে কেউ বলেনি?

মাসুদ : না তো। অবশ্য আগে কোনো রমনী আমার কথা শোনেই নি।

আখি : ভালোই চাপা জানেন।

মাসুদ : আচ্ছা আপনার প্রিয় ফুল কি?

আখি : অনেক ফুলই তো পছন্দের। তবে সবচে প্রিয় গোলাপ।

মাসুদ : সাদা গোলাপ নাকি কালো গোলাপ?

আখি : লাল গোলাপ।

মাসুদ : ওহ। আপনার তো আবার সাদা-কালো পছন্দ তাই ভাবলাম...

আখি : আপনার?

মাসুদ : কি?

আখি : আপনার প্রিয় ফুল কি?

মাসুদ : বিউটিফুল।

[এবার জোরে হেসে ফেলে আখি]

আখি : এত ঢং কোথায় শিখেছেন?

মাসুদ : বিশ্বাজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র।

[পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল মাসুদের দুই বন্ধু সজিব ও জুনায়েদ। তারা মাসুদকে দেখেই থমকে দাঁড়ায়। মাসুদকে পার্কে একটি মেয়ের সাথে বসে কথা বলতে দেখে তারা মনে করে সে প্রেম করছে। মাসুদকে কুপোকাত করার একটি মহা সুযোগ তারা পেয়ে যায়। এতদিন পরে তাকে বাগে পাওয়া গেল। প্রথমেই তারা মাসুদ আর আখির কয়েকটা ছবি তোলে আর ভিডিও করে। একটু আড়াল নিয়ে মাসুদকে ফোন দেয় তারা। মাসুদ পকেট থেকে ফোন বের করে ফোন রিসিভ করে]

সজিব : হ্যালো মামা। মামা তুমি কোথায় মামা?

মাসুদ : আছি একটু দূরে। কিছু বলবি?

সজিব : দূরে কোথায় মামা?

মাসুদ : আছি। একটু ব্যস্ত। পরে কথা বলি।

সজিব : তোমার সাথে যে একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল মামা।

মাসুদ : আচ্ছা আমি তোরে ফ্রি হয়ে ফোন দিব।

[জুনায়েদ সজিবের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে মাসুদের সাথে কথা বলতে শুরু করে]

জুনায়েদ : তোমার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ আছে মামা। আইন ভঙ্গের অভিযোগ। যাহা দণ্ডনীয় অপরাধ। তোমার সশ্রম দণ্ড হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মামা। তুমি ৫ মিনিটের মধ্যে সভাস্থলে চলিয়া আসো নয়তো তোমার অবস্থান আমাদের বলো আমরা চলিয়া আসি।

[মাসুদ তাদের সাথে কথা প্যাচাতে চাচ্ছে না এই মুহূর্তে।]

মাসুদ : আমি কোনো রুলস ভঙ্গ করি নি। আর ৫ মিনিটের মধ্যে আসা সম্ভব না। আমি বিকালে তোদের সাথে দেখা করব। বাই।

[ফোন কেটে দেয়ার পর তারা মাসুদকে পেছন থেকে ডাক দেয়।]

সজিব : এ মাসুদ। কি করছিস এখানে? তুই কি আর ভালো হবি না? ভালো হয়ে যা মাসুদ ভালো হয়ে যা।

আখি : মাসুদ মানে! আপনার নাম মাসুদ?

মাসুদ : হ্যাঁ... না।

আখি : হ্যাঁ... না মানে কি?

সজিব : ভালো হয়ে যা মাসুদ। ভালো হয়ে যা।

[আখি ভাবে মাসুদ তার কাছে অনেক কিছু লুকিয়েছে। অনেক মেয়ের সাথেই হয়ত তার সম্পর্ক আছে। সে ক্যারেক্টারলেস।]

আখি : বুঝছি।

[এই বলে সে উঠে দাঁড়ায় আর মাসুদের দিকে ঘৃণার চোখে তাকিয়ে বলে]

আখি : দেখে একদম বোঝার উপায় নেই।

[এই বলে সে হাঁটা দেয়। হা হয়ে যায় মাসুদ। সে একবার আখির গমনপথের দিকে তাকায় আরেকবার বন্ধুদের দিকে। আর বন্ধুদের মুখে তখন বিজয়ীর হাসি]

দৃশ্য-৯

বাহির-রাত-গ্যারেজ (মাসুদ ও ছোটন)

[মাসুদ অফিস থেকে ফেরার পথে প্রায়ই ছোটনের গ্যারেজে বসে। গ্যারেজের পাশে কোথাও বসে চা খাচ্ছে সে। ছোটন গান ধরেছে- সর্বোত মঙ্গলো রাধে বিনোদিনি রাই... গান শেষ হলে ছোটন বলে]

ছোটন : ঐ গানটা ধরুম ভাই?

[মাসুদ ঘড়ির দিতে তাকিয়ে]

মাসুদ : না রে, আজ আর না। আজকে উঠি।

[সে উঠে পরে]

দৃশ্য-১০

বাহির-দিন-চায়ের দোকান (সজিব, জুনায়েদ, অনিক, খোকা ও মাসুদ)

[খোকা এবনরমাল। তাকে দোকান থেকে এটা সেটা কিনে খাওয়াচ্ছে সজিব ও জুনায়েদ। বিনিময়ে খোকা মাসুদকে টিটকারি মেরে কথা বলবে। খোকা চায়ের সাথে পাউরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে। দোকানদারের ফোনে গান বাজছে বোঝেনা সে বোঝেনা ...]

খোকা : ছোটবেলা থেইকা শুনতাছি বোজোনা সে বোজেনা। এতদিনেও বুজলোনা মাইয়াডায়!

[কথা শুনে হেসে ফেলে সবাই]

সজিব : কথায় যুক্তি আছে।

খোকা : ভাই আরেকটা চা।

[জুনায়েদ বিরক্ত হয়ে বলে]

জুনায়েদ : চা একসাথে মানুষ কয়টা খায়?

[সজিব জুনায়েদকে থামিয়ে দিয়ে দেকানদারকে চা দিতে বলে]

সজিব : দাও মামা চা দাও।

[খোকা দ্বীতিয় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে]

খোকা : ভাই একটা ড্রাই কেক।

[জুনায়েদ বিরক্ত হয়ে বলে]

জুনায়েদ : খা।

অনিক : সবই ঠিক আছে। তাই বলে অন্য মানুষকে দিয়ে ক্ষ্যাপানো ঠিক হবে?

সজিব : নো পক্ষপাতিত্ব, নো কম্প্রোমাইজ, নো সিমপ্যাথি।

অনিক : না ব্যাপারটা তা না।

[এর মধ্যে মাসুদ এসে যায়।]

সজিব : আহো মামা আহো।

মাসুদ : কি সমস্যা?

সজিব : কোনো সমস্যা নাই মামা।

[এদিকে জুনায়েদ খোকাকে খোচাতে থাকে। খোকা চায়ের কাপ রেখে মাসুদ বলতে গিয়ে ভুল করে মারুফ বলে ফেলে]

খোকা : মারুফ ভাই ভালো হয়ে যান। ভালো হতে পয়সা লাগে না।

[বলেই সে দোকান থেকে বের হয়ে দেয় ছুট। মাসুদ তার বন্ধুদের দিকে তাকায়]

মাসুদ : এগুলো কি?

জুনায়েদ : এগুলো কিছু না মামা। চলো সভা আছে। বিচার হবে।

মাসুদ : কিসের বিচার?

সজিব : ওলে আমাল বাবুটা। কিচ্ছু বোজেনা। দুদু খায়।

[এরপর তাকে সবাই একপ্রকার জোর করে ধরে নিয়ে যায়]

দৃশ্য-১১

বাহির-দিন-পার্ক (মাসুদ ও তার বন্ধুরা)

[সবাই মাঠে গোল হয়ে বসা। বিচারকার্য শুরু হবে। নীরবতা ভেঙে সজিব তার ফোনে তোলা পার্কের সেই ছবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখায়]

সজিব : এই দ্যাখ।

[মাসুদ মুখ ভেংচিয়ে বলে]

মাসুদ : এই দ্যাখ এই দ্যাখ। এই ছবি দিয়ে কি প্রমাণিত হয়?

জুনায়েদ : এটাই প্রমাণিত হয় যে- তুমি গ্রিন ফ্রেন্ডহুড এর উন্মত্ত কার্যবিধি ২০১৮ এর ১ এর ‘ক’ ধারা লঙ্ঘন করিয়াছো। অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে প্রেমের সম্পর্কে জড়াইয়াছো।

মাসুদ : আমি এই মেয়ের সাথে প্রেম করি কে বলল?

সজিব : তাহা না হইলে মেয়েটি আমাদের কথা শুনিয়া চলিয়া গেল কেন?

[মাসুদও উপহাসের সুরে বলে]

মাসুদ : তাহাতেই প্রমাণ হইয়া গেল?

অনিক : কথা প্যাচানো চলবে না মাসুদ। তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল আছে। তুই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ কর। প্রমাণ করতে না পারলে দণ্ডের জন্য তৈরি হ। অলরেডি জুড়ি বোর্ড গঠন করা হয়ে গেছে। আমি, সজিব আর জুনায়েদ।

[মাসুদ পকেট থেকে ফোন বের করে মেয়েটির নাম্বারে ফোন দেয়]

মাসুদ : ওকে দাঁড়া। আভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করছি।

সজিব : কাকে ফোন দিচ্ছিস?

মাসুদ : মেয়েটিকেই ফোন দিচ্ছি।

সজিব : তা হবে না। তা হবে না। সে বললেই আমরা বিশ্বাস করিব এমনটা ভাবিলে কি প্রকারে?

মাসুদ : মানে!

জুনায়েদ : তুই যে তাকে আগে থেকেই পড়িয়ে নিসনি তার প্রমাণ কে করবে?

মাসুদ : আশ্চর্য!

সজিব : অবশ্যই আশ্চর্য!

মাসুদ : দ্যাখ ভাই, মেয়েটির সাথে আমার বিয়ের কথা চলছে। আজকে সে দেখা করতে চেয়েছিল, আজকেই প্রথম দেখা করলাম।

সজিব : আমাদের না জানিয়ে বিয়ে পাকাপাকি! তুই তো ধারা ৪ ও লঙ্ঘণ করেছিস।

মাসুদ : আরে ভাই আমি কি জানাতাম না?

অনিক : ফোন ধরছে?

মাসুদ : ফোন ধরে না ক্যান!

অনিক : বুঝছি মামা তুমি ফেঁসে গেছো।

[এসময় সবাই গান ধরে- তুমি ফাঁইসা গেছো, ...মাইনকা চিপায়]

মাসুদ : শোন ভাই, আমাকে প্রমাণ করার সুযোগ দিতে হবে।

সজিব : তুই প্রমাণ করতে পারবি না, এটা প্রমাণিত।

[আবার সবাই গান ধরে- তুমি ফাঁইসা গেছো, তুমি ফাঁইসা গেছো মাইনকা চিপায়...। মাসুদ সুযোগ বুঝে দেয় ছুট। তাকে ধাওয়া করে সবাই, কিন্তু ধরতে পারে না]

দৃশ্য-১২

ভিতর-দিন-অফিস (মাসুদ, কয়েকজন কলিগ, অফিসের ডিরেক্টর, নতুন এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর)

[নিজের ডেস্কে বসে কাজ করছে মাসুদ। একজন কলিগ এসে জানায় ডিরেক্টর স্যার তাকে ডেকেছেন।]

কলিগ : মাসুদ সাহেব ডিরেক্টর স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

মাসুদ : আসছি।

[মাসুদ তার হাতের কাজ রেখে ডিরেক্টরের রুমে যায়। তার রুমে এক লেডি বসে আছেন। রুমের এক কোনায় একটি রোল আপ ব্যানার। ব্যানারে এক মডেল "ক্লিন সানগ্লাস" পরে আছে। পাশ দিয়ে লেখা "ক্লিন সানগ্লাস, পুরাই ক্লিন"। মাসুদ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে-]

মাসুদ : মে আই কাম ইন?

ডিরেক্টর : ইয়েস, প্লিজ।

[মাসুদ রুমে ঢুকলে ডিরেক্টর মাসুদকে বসতে বলে]

ডিরেক্টর : সেট। মাসুদ, আপনি তো কালকে ছিলেন না। আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি মিস মায়েশা। মায়েশা এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে জয়েন করেছেন। মায়েশা, ইনি মি. আহমেদ পারভেজ। আমাদের একাউন্ট দেখছেন।

[মায়েশা মাসুদকে উদ্দেশ্য করে]

মায়েশা : হ্যালো।

মাসুদ : হাই।

ডিরেক্টর : নেক্সট উইকে আমি লন্ডন যাচ্ছি। দিন ১৫ থাকব। এদিকটা মায়েশাই দেখবেন।

মাসুদ : ওকে স্যার। আমার হাতে কাজ আছে স্যার, অনুমতি দিলে আমি উঠব।

ডিরেক্টর : ওকে।

[মাসুদ রুম থেকে বেরিয়ে যায়]

দৃশ্য-১৩

ভিতর-দিন-অফিস (এডফার্মের এক প্রতিনিধি ও মায়েশা)

[একটি সানগ্লাসের বিজ্ঞাপন নিয়ে এড ফার্মের একজন প্রতিনিধির সাথে মিটিং করছে মায়েশা]

প্রতিনিধি : ধরুন সয়ম্বর হচ্ছে। সারি সারি পাত্র দাঁড়িয়ে আছে। একেকজনের চোখে একেক ধরনের সানগ্লাস। তার মধ্যে এক পাত্রের চোখে "ক্লিন সানগ্লাস'। পাত্রীর নজর আটকে যায় ক্লিন সানগ্লাসে। সে পাত্রের কাছে গিয়ে গ্লাসটা খুলে নিজের চোখে পরে। ছেলেটার চেহারা অতটা ভালো না হলেও গ্লাসের চোখে তাকে অপূর্ব লাগবে। সে ইমপ্রেস হয়ে যায়।

মায়েশা : হুম ভালো। কিন্তু একটু সেকেলে সেকেলে ভাব আছে। একটু আধুনিক কিছু চিন্তা করা যায় না?

[এসময় পিওন দুই কাপ কফি দিয়ে যায়। কফিতে চুমুক দিয়ে প্রতিনিধি বলে]

প্রতিনিধি : এরকম হলে কেমন হয়? ধরুন, এক বৃদ্ধ। তার প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস। বয়সের কারণে চোখে এখন আর ঠিক মত দেখেন না। প্রতিদিন ছোট মেয়েকে ডেকে তাকে দিয়ে পড়ায় আর সে শোনে। এসময় বৃদ্ধের ছেলের ফোন আসে। ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করে কি করছ বাবা? বৃদ্ধ বলে পত্রিকা শুনছি। ছেলে বলে- পত্রিকা শুনছ মানে! বাবা বলে- চশমাটা পড়লেই মাথা ধরে। তাই পড়ি না। সুমি পড়ছে আর আমি শুনছি। ...এরপর ছুটিতে ছেলে বাড়িতে আসে। বাবার জন্য ক্লিন গ্লাস এর চশমা নিয়ে আসে। বৃদ্ধ চশমা চোখে দিয়ে গড়গড় করে পড়তে থাকে। আর বলতে থাকে- সব ক্লিন, সব ক্লিন।

মায়েশা : ভালো। কিন্তু অভিভূত হতে পারলাম না। ভাইরাল কোনো টপিক নিয়ে চিন্তা করুন। রিসেন্টলি ভাইরাল হয়েছে এমন কোনো টপিক। ফানি হলে ভালো হয়। ফানি হলে মানুষ মনে রাখে। মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। মানুষের মুখে মুখে থাকে। বন্ধুমহলে আলোচনা হয়। এমন কিছু একটা চিন্তা করে দেখুন তো।

প্রতিনিধি : ওকে ম্যাম। দেখি, চিন্তা করি। আজকে উঠি তাহলে। আর ফোনে কথা হবে।

মায়েশা : ওকে।

[প্রতিনিধি বিদায় নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।]

দৃশ্য-১৪

ভিতর-দিন-বাসা (মাসুদ ও তার মা)

[মাসুদ বাসায় খাটে শুয়ে বই পড়ছিল। তাকে ফোন দিচ্ছে সজিব। সে বারবার ফোন কেটে দিচ্ছে। তার মা তার জন্য চা নিয়ে আসে। তার হাতে চা তুলে দিয়ে বিছানায় বসে। আর মাসুদের মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। মাসুদ চায়ে চুমুক দেয়।]

মা : মেয়েটার সাথে দেখা করেছিস?

মাসুদ : কোন মেয়েটা?

মা : আখি।

[মাসুদ ভ্রু কুচকে বলে]

মাসুদ : হুম।

মা : কেমন মনে হলো?

মাসুদ : ভালো না।

মা : কেন?

মাসুদ : কেন আবার কি! ভালো না তাই ভালো মনে হয়নি।

মা : কোন দিকটা খারাপ মনে হয়েছে?

মাসুদ : এত কথা বলতে পারব না।

[এই কথা বলে সে চা রেখে উঠে যায়।]

দৃশ্য-১৫

ভিতর-দিন-বাসা-বারান্দা (মাসুদ)

[মাসুদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। চেহারায় বিষণ্ন ভাব। সিগারেটে টান দিয়ে গোল্লা গোল্লা করে ধোয়া ছাড়ে। এমন সময় তার ফোনে আননোন নাম্বার থেকে কল আসে। তার কোনো এক বন্ধু কণ্ঠ বিকৃত করে ফোন দিয়ে তার সাথে মজা নেয়।]

মাসুদ : হ্যালো।

রেকর্ড ভয়েজ : হ্যালো আস সালামু আলাইকুম।

মাসুদ : অলাইকুম সালাম। কে বলছেন?

রেকর্ড ভয়েজ : মাসুদ সাহেব বলছেন?

মাসুদ : জি বলছি।

রেকর্ড ভয়েজ : টাকাটা তো দিলেন না ভাই।

মাসুদ : কিসের টাকা? আপনি কে?

রেকর্ড ভয়েজ : হ্যাঁ, এখন তো চিনবেনই না। ভণিতা বাদ দিলে বলুন টাকাটা কবে দিবেন?

মাসুদ : আশ্চর্য! আপনাকে তো আমি চিনিই না। আর আমি ধার করি না। আপনি বোধ হয় রং নাম্বারে ফোন দিয়েছেন।

রেকর্ড ভয়েজ : কিসের রং নাম্বার মিয়া? এপস্যুলেটলি রাইট নাম্বার। আপনি মাসুদ না?

মাসুদ : মাসুদ কি বাংলাদেশে একজন নাকি?

রেকর্ড ভয়েজ : আমার সাথে মাসুদগিরি চলবে না। ভালোয় ভালোয় টাকাটা দিয়ে দিন। আর সময় থাকতে ভালো হয়ে যান।

[মাসুদ রেগে লাল হয়ে যায়। সে ফোনটা কেটে দেয়]

দৃশ্য-১৬

ভিতর-দিন-অফিস (মায়েশা ও ডিরেক্টর)

[ডিরেক্টর লন্ডন থেকে এখনো ফেরেনি। মায়েশা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ডিরেক্টরের সাথে ফোনে কথা বলে]

মায়েশা : বিজ্ঞাপনটা দেখেছেন স্যার?

ডিরেক্টর : হ্যাঁ দেখেছি। ভালো হয়েছে। কিন্তু... থাক কিছু না।

মায়েশা : কনফার্ম করে দিব স্যার?

ডিরেক্টর : হ্যাঁ দিয়ে দিন। আমার একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ করে কথা বলব। এখন রাখি। বাই।

মায়েশা : ওকে বাই।

দৃশ্য-১৭

ভিতর-দিন-অফিস (মায়েশা ও বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি)

[ফোনে কথা হচ্ছে]

মায়েশা : হ্যালো।

প্রতিনিধি : স্লামালেকুম ম্যাডাম।

মায়েশা : অলাইকুম সালাম। রফিক সাহেব, স্যারতো বিজ্ঞাপন এ্যাপ্রুভ করেছেন। এইমাত্র কনফার্ম করলেন।

প্রতিনিধি : ব্রাভো।

দৃশ্য-১৮

ভিতর-রাত-বাসা (মাসুদ ও মাসুদের মা)

[মাসুদ তার বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আছে। মন মেজাজ খুব খারাপ। তার মা টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে আর মাসুদকে খাওয়ার জন্য ডাকছে]

মা : খেতে আয়।

[মাসুদ একইভাবে শুয়ে আছে। তার কোনো সাড়া নেই। মা আবারো ডাকে]

মা : মাসুদ, খেতে আয়।

মাসুদ : খাবো না। তুমি খেয়ে নাও।

মা : খাবি না মানে!

[মা এসে মাসুদের পাশে বসে]

মা : এই তোর কি হয়েছে? ক'দিন ধরেই দেখছি তোর মন মেজাজ খারাপ। কি হয়েছে তোর?

মাসুদ : কিছু হয়নি। তুমি যাও খেয়ে শুয়ে পড়ো।

মা : আহা! কি হয়েছে বল না।

মাসুদ : কিছু হয়নি। ডায়েট করছি। তুমি খেয়ে নাও।

[মা মুখটা শুকনো করে আস্তে করে উঠে চলে যায়।]

দৃশ্য-১৯

বাহির-দিন-রাস্তা (মাসুদ, ছোটন, জনৈক ব্যক্তি)

[মাসুদ বাইক নিয়ে অফিসে যাচ্ছে। পথে ছোটনের গ্যারেজে থামে। গ্যারেজের পাশে বসে এক লোক পত্রিকা পড়ছে। সে বেছে বেছে ধর্ষণের নিউজ পড়ছে। পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে যেখানে যেখানে ধর্ষণের নিউজ পাচ্ছে সেগুলো পড়ছে]

মাসুদ : দ্যাখতো ব্রেকটায় ঝামেলা করতেছে খুব।

ছোটন : দ্যাখতাছি ভাই।

[ছোটন বাইক ঠিক করার চেষ্টা করছে। আর মাসুদ একটু পর পর ঘড়ি দেখছে]

মাসুদ : তাড়াতাড়ি দ্যাখ। হাতে সময় নেই। অলরেডি লেট হয়ে গেছে।

[ছোটন কিছুক্ষণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে।]

ছোটন : ভাই, ব্রেক শু টা পাল্টাইতে হইব মনে অয়। সময় লাগবো। আপনে আইজকা রিক্সায় চইলা যান।

[মাসুদ আবার ঘড়ি দেখে। এরপর সে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ছোটনকে দিয়ে বলে]

মাসুদ : এই ধর। ঠিক করে রাখিস। ফেরার পথে নিয়ে যাবো।

[একটা রিক্সা ডেকে উঠে পরে মাসুদ। সে চলে গেলে পত্রিকা পড়া লোকটি বলে]

জনৈক ব্যক্তি : মাসুদ কি ভালো হইছে না আগের মতই আছে।

ছোটন : মানে! উনি খারাপ ছিল কবে?

জনৈক ব্যক্তি : দুষ্টুমি করলাম। মাসুদরা তো সাধারণত ভালো হয় না।

ছোটন : মাসুদ ভাইরে নিয়া আজেবাজে কথা কইবেন না।

জনৈক ব্যক্তি : ক্যান, সে মনে হয় ফেরেস্তা!

ছোটন : দ্যাখেন ভালো অইব না কিন্তু।

জনৈক ব্যক্তি : ভালো হবে না মানে! কি করবি? বেয়াদব কোথাকার!

ছোটন : আপনে বেয়াদব। আসল মাসুদ হইছেন আপনে মিয়া। কাম নাই কাজ নাই সারাদিন ধর্ষণের নিউজ পড়েন। পত্রিকা দ্যান।

[এই কথা শুনে ক্ষেপে যায় লোকটা সে ছোটনকে তেড়ে যায়। ছোটনও কম যায় না। তার মাসুদ ভাইয়ের সম্মান বলে কথা। সেও তার হাতে থাকা রেঞ্জ নিয়ে তেড়ে যায়। ছোটনের চোখে আগুন দেখে সে পিছিয়ে যায়।]

জনৈক ব্যক্তি : হালায় তো একটা ছোটা মাসুদ।

[ছোটন এবার গালি দিয়ে হাতের রেঞ্জ তার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার গায়ে পড়ে না। সে দৌড় মারে। ছোটন রেঞ্জটা আবার তুলে নিয়ে তাকে ধাওয়া করে।]

দৃশ্য-২০

ভিতর-দিন-অফিস (মায়েশা ও পিওন)

[মায়েশা পিওনকে ডেকে পাঠায়। পিওন ম্যাডামের রুমে ঢোকে।]

মায়েশা : মাসুদ সাহেব এসেছেন?

পিওন : না ম্যাডাম।

মায়েশা : কি ব্যাপার! উনি কি প্রতিদিনই দেরি করেন নাকি? আমি আসার পর থেকেই দেখছি প্রায় প্রতিদিনই লেট। আচ্ছা যাও।

[পিওন বের হয়ে যাচ্ছিল রুম থেকে।]

মায়েশা : আচ্ছা শোনো মাসুদ সাহেব আসলে আমার রুমে পাঠিয়ে দিও। আর আমাকে চা দাও।

দৃশ্য-২১

বাহির-দিন-রাস্তা (মাসুদ ও রিক্সাওয়ালা)

[মাসুদ রিক্সায় করে অফিস যাচ্ছে। এসময় তার ফোনে ফোন আসে। তার এক বন্ধুই ফোন দিয়ে তার সাথে মজা নেয়।]

মাসুদ : হ্যালো।

ভয়েজ রেকর্ড : মাসুদ সাহেব আপনি কি ভালো হবেন না। আমার টাকাটা নিয়ে আর কত দিন ঘোরাবেন? টাকাটা দিয়ে দিন আর ভালো হয়ে যান।

[এবার মাসুদের ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙে যায়। সে রেগে গিয়ে আচ্ছামতো মুখে যা আসে তা ব্যবহার করে। ইচ্ছে মত গালাগাল দেয়।]

মাসুদ : এই টুত টুত টুত...

দৃশ্য-২২

বাহির-দিন-চায়ের দোকান (সজিব, জুনায়েদসহ মাসুদের কয়েকজন বন্ধু)

[মাসুদকে ক্ষেপিয়ে সবাই অট্টহাসিতে মেতে উঠেছে। অনিক বলে]

অনিক : ছেলেটাকে তোরা নাস্তানাবুদ করে ছাড়লি।

সজিব : মজা পাইছো কি না সেটা বল। বুকে হাত দিয়ে বল।

অনিক : মজা পাইছি। সত্য। কিন্তু বিষয়টা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না?

জুনায়েদ : বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আবার বাড়াবাড়ি টাড়াবাড়ি কি?

অনিক : না... আমার মনে হচ্ছে বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে। সে নিতে পারতেছে না।

সজিব : সে নিতে পারতেছে না সেটা তার ব্যর্থতা।

[জুনায়েদের দিকে তাকিয়ে]

সজিব : কি কও?

[জুনায়েদ মাথা দুলিয়ে সজিবের কথায় সমর্থন দেয়]

দৃশ্য-২৩

বাহির-দিন-অফিসের গেট (মাসুদ ও দারোয়ান)

[মাসুদ রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যখন অফিসে ঢুকছে তখন দারোয়ান ফোনে কথা বলছিল। কাকতালীয়ভাবে সে এক পাওনাদারের সাথে কথা বলছিল। মাসুদ যখন ঢোকে ঠিক সেই মুহূর্তে সে এক হাতে গেট খুলছে আর হাতে ফোনে বলছে]

দারোয়ান : ভালো হয়ে যা ভাই ভালো হয়ে যা। গরীব মানুষ ঠকাইস না। উপরে তো একজন আছে।

[মাসুদ ভাবে দারোয়ান তাকে টিটকারি মেরে এসব বলছে। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। একটা দারোয়ানও তার সাথে এভাবে মজা নিচ্ছে! সে রেগে গিয়ে ধামাধাম কয়েকটা চড় লাগিয়ে দেয় দারোয়ানকে। দারোয়ানের হাত থেকে ফোনটা ছিটকে পরে যায়। সে থতমত খেয়ে মাসুদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাসুদ একটা গালি দিয়ে অফিসে ঢুকে যায়]

দৃশ্য-২৪

ভিতর-দিন-অফিস (মাসুদ ও পিওন)

[মাসুদ অফিসে ঢুকে কেবল তার ডেস্কে গিয়ে বসেছে। পিওন এসে তাকে জানিয়ে দিল ম্যাডাম তাকে ডেকেছেন। শুনে মাসুদ ম্যাডামের রুমে যায়]

মাসুদ : স্লামালেকুম।

মায়েশা : অলাইকুম সালাম। আসুন বসুন। কি ব্যাপার মাসুদ সাহেব। আপনার সমস্যা কি?

[মাসুদ গিয়ে ম্যাডামের সামনের চেয়ারে বসে।]

মায়েশা : আপনি তো দেখছি প্রতিদিনই লেট করে অফিসে আসেন। সমস্যাটা কোথায়? এভাবে তো কোনো অফিস চলতে পারে না। গতকাল ২৫ মিনিট লেট। আজকে ৪৫ মিনিট লেট।

মাসুদ : বাইকটা পথে নষ্ট হয়ে যায়।

মায়েশা : অজুহাত রাখুন। প্রতিদিন তো আর বাইক নষ্ট হয় না। হয়?

[মাসুদ মাথা নিচু করে জবাব দেয়]

মাসুদ : জি না ম্যাডাম।

মায়েশা : আপনি তো আর ছাত্র না। আপনাকে তো মোটিভেশন দেয়া সাজে না।

[মায়েশা ম্যাডাম একটি ফাইল ধরিয়ে দেয় মাসুদকে।]

মায়েশা : এই প্রজেক্টের জন্য কিছু টাকা লাগবে। টাকার অংক দেয়া আছে। দেলোয়ার সাহেবকে চেক দিয়ে দিন।

মাসুদ : জি ম্যাডাম।

মায়েশা : আসুন।

[মাসুদ রুম থেকে বের হয়ে যায়। মায়েশা তার গমনপথের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে]

দৃশ্য-২৫

ভিতর-দিন-অফিস (মায়েশা, মাসুদ, দারোয়ান ও পিওন)

[দারোয়ান কাঁদছে আর ম্যাডামের কাছে থাপ্পরের বিচার জানাচ্ছে]

দারোয়ান : গরীব বইলা কি আমরা মানুষ না? আমি কি করছি। আমি অন্যায়টা করছি কি? শুধু শুধু সে আমার গায়ে ক্যান হাত তুলল? আর আমিতো তার চাকরি করি না। অন্যায় করলে আমার বিচার আমার ছার করবো। উনি অমার গায়ে হাত তুলল ক্যান?

মাসুদ : তুই কিছু করিস নি? বেয়াদব, মিথ্যা কথা বলিস আবার!

দারোয়ান : কি করছি আমি কন। আল্লাহ আছেন একজন উপরে। আপনারে ভালো মানুষ মনে করছিলাম। আপনারে আমি অনেক সম্মান করতাম। কিন্তু আপনি যে এমন তা জানতাম না। অন্যায়ভাবে গায় হাত তুলবে আবার বলবে বেয়াদব, মিথ্যাবাদী। ...লাগব না বিচার। বিচার আল্লায় করব। বিচার আল্লার কাছে দিলাম।

[এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে উঠে চলে যায়।]

মায়েশা : মাসুদ সাহেব আপনার সমস্যাটা কি? লোকটার গায়ে হাত তুললেন কেন আপনি?

মাসুদ : বেয়াদবি করেছে ম্যাডাম।

মায়েশা : কি বেয়াদবি করেছে?

মাসুদ : বলতে পারব না।

[এই বলে সে-ও উঠে চলে যায়। মায়েশা হা করে তাকিয়ে]

মায়েশা : আশ্চর্য মানুষ তো!

দৃশ্য-২৬

বাহির-রাত-গ্যারেজ (মাসুদ ও ছোটন)

[মাসুদ অফিস থেকে ফেরার পথে ছোটনের গ্যারেজে বসে। মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। ছোটন পানি দিয়ে হাতের কালি মুছছে। মাসুদের পাশে গিয়ে বসে।]

ছোটন : ভাই, আপনার কি হইছে ভাই?

মাসুদ : কিছু না।

ছোটন : আমারে কইবেন না?

মাসুদ : বললাম তো কিছু হয় নি।

ছোটন : একটা গান ধরুম ভাই?

মাসুদ : আহ! ডিস্টার্ব করতে না করলাম না?

[আরো কিছুক্ষণ নিশ্চুপে বসে থেকে উঠে চলে যায় মাসুদ। ছোটন তার দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকে]

দৃশ্য-২৭

ভিতর-রাত-বাসা (মাসুদ ও মাসুদের মা)

[কলিং বেল বেজে ওঠে। মাসুদের মা দরজা খোলে। মাসুদ ভিতরে ঢোকে। মাসুদের মা জিজ্ঞেস করে]

মা : ওষুধ এনেছিস?

মাসুদ : ওহ হো! ভুলে গেছি মা। আচ্ছা নিয়ে আসছি।

মা : এখন যেতে হবে না। সকালে যাবার আগে দিয়ে যাস।

মাসুদ : না। সকালে তাড়া থাকে। তারচে এখনি গিয়ে নিয়ে আসি।

[এই বলে সে ওষুধ আনতে চলে যায়]

দৃশ্য-২৮

বাহির-রাত-রাস্তা (মাসুদ, ও এলাকার দু'টি ছোট ভাই অর্ক ও প্রান্ত)

[মাসুদ হেঁটে যাচ্ছে ফার্মেসিতে। পথে এলাকার দু'টি ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা। তারা মাসুদকে দেখে সালাম দেয়]

অর্ক : ভাই স্লামালেকুম।

মাসুদ : অলাইকুম সালাম। কেমন আছো অর্ক?

[অন্যজনকে উদ্দেশ্য করে]

মাসুদ : তোমার নাম যেন কি?

প্রান্ত : প্রান্ত, ভাই।

মাসুদ : ভালো আছো না?

প্রান্ত : জি ভাই।

মাসুদ : তোমরা এবার কিসে পড়ো?

অর্ক : ইন্টারে উঠলাম ভাই।

মাসুদ : ওহ ভালো। পড়াশুনা কইরো। ফাঁকি দিও না।

অর্ক : জি ভাই।

মাসুদ : আচ্ছা যাও তাইলে। বাসায় যাইও।

অর্ক : আচ্ছা ভাই।

[এরপর তারা পরস্পরকে ক্রস করে চলে যায়। কয়েক পা গিয়েই মাসুদকে শুনিয়ে অর্ক প্রান্তকে বলে-]

অর্ক : তুই আর ভালো হইলি না। এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যা।

[কথাগুলো শুনেই মাসুদ ঘুরে তাদের ডাক দেয়। তারা কাছে আসলে মাসুদ অর্ককে একটা কষে চড় বসিয়ে দেয়। চড় খেয়ে অর্ক দৌড় লাগায়। মাসুদ কিছুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে ওদের।]

দৃশ্য-২৯

বাহির-দিন-চায়ের দোকান (মাসুদের বন্ধুরা)

[মাসুদের বন্ধুরা সবাই চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। মাসুদের বন্ধু সজিব এসে দোকানে ঢোকে। সে খুবই উৎফুল্ল।]

সজিব : খবর আছে মাম্মা। জব্বর খবর।

জুনায়েদ : কি খবর?

সজিব : লাখ টাকার খবর মাম্মা।

[এই বলে সে পকেট থেকে তার ফোনটা বের করে জুনায়েদের হাতে দেয়]

সজিব : দ্যাখ।

[জুনায়েদ ফোনটা হাতে নেয়। সবাই ফোনের দিকে ঝুঁকে পরে। ফোনের একটা ভিডিও ওপেন করে দেখে মাসুদদের কোম্পানির ক্লিন গ্লাসের বিজ্ঞাপন।]

বিজ্ঞাপনঃ

[এক চায়ের দোকানে বসে বাবা-ছেলেকে বোঝাচ্ছে এক আদম ব্যাপারী।]

পড়ালেখা কইরা কি অইবো। দ্যাশের চাকরির বাজার কেমন দ্যাখেন না! ৩০ বছর পড়ালেখা কইরা চাকরির জন্য আবার ১০ লাখ টাকা ঘুষ দাও। আমি বলি কি, পড়াল্যাহা যা করছে এনাফ। বিদেশ পাঠায়া দ্যান। এই মাসে যাইবো আগামী মাসে রিয়াল পাঠাইবো। কার্ড কইরা দিমু। মেশিনে কার্ড ঢুকাইবেন, কড়কড় কড়কড় কইরা টাকা নাইমা আসব।

ভিসা রেডি। ক্লিন ভিসা। আমি এক কথার মানুষ। তাইরে-নাইরের মধ্যে নাই। টাকা জোগাড় করেন। টাকা জোগাড় করতে না পারলে তাও কন। আমি ব্যবস্থা করুম। যৎ সামান্য ইন্টারেস্ট দিলেই চলব।

এসময় ছেলেটা তার বুক পকেট থেকে ক্লিন গ্লাস এর সানগ্লাসটা বের করে চোখে দেয়। চোখে দিয়ে আদম ব্যাপারীর দিকে তাকাতেই চশমায় একটা লাল ঝিলিক খেলে যায়, রেড অ্যালার্ট এর মতো। সাথে সাথে চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে ছেলেটি বলে বাবা উনি একটা মাসুদ।

[বিজ্ঞাপন দেখে হেসে সবাই খুন]

জুনায়েদ : এটা মাসুদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন না?

সজিব : হ ব্যাটা।

জুনায়েদ : দুনিয়ায় আল্লায় যে কতরকম বিনোদনের ব্যবস্থা কইরা রাখছে!

সজিব : এদিক দে, মাসুদরে ইনবক্স করি।

[সে ফোনটা নিয়ে লিংকটা মাসুদকে ইনবক্স করে]

দৃশ্য-৩০

ভিতর-দিন-অফিস (মাসুদ, মায়েশা ও কয়েকজন কলিগ)

[মাসুদ অফিসে ঢুকে তার ডেস্কে বসেই রিজাইন লেটার লেখে। এরপর সেটা নিয়ে যায় মায়েশার কাছে।]

মায়েশা : এটা কি?

মাসুদ : রিজাইন লেটার।

মায়েশা : মানে!

মাসুদ : এত বড় চেয়ারে বসছেন আর রিজাইন লেটারের মানে জানেন না!

[এই বলেই সে বেরিয়ে যায়। অফিস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এমন সময় এক কলিগ মাসুদকে ডাক দেয়।]

কলিগ : মাসুদ সাহেব।

[মাসুদ ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ায়। কলিগ দুষ্টুমি করে একটা সানগ্লাস চোখে দিয়ে শকড খেয়েছে এমন ভঙ্গি করে সানগ্লাসটা চোখ থেকে নামিয়ে ফেলে বলে-]

কলিগ : সত্যিই তো মাসুদ প্রুফ।

মাসুদ : তাই নাকি? কই দেখি।

[মাসুদ তার দিকে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে হুট করে তার কলারটা ধরে ফেলে। আর কলিগ ভরকে যায়। ভয়ে চিল্লপাল্লা শুরু করে দেয়। তার চিল্লাপাল্লায় আসপাশের কলিগরাও চলে আসে। মায়েশাও চলে আসে। মায়েশা চিৎকার করে ব-েল]

মায়েশা : মাসুদ সাহেব।

[মায়েশার কণ্ঠ শুনে কলিগের কলার ছেড়ে দেয় মাসুদ]

মায়েশা : আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

[কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যায় মাসুদ।]

দৃশ্য-৩১

বাহির-দিন-পার্ক (মাসুদের বন্ধুরা)

[পার্কে বসে আছে সবাই। একজন মাসুদকে ফোন দেয়। মাসুদ মিন্টু মামার চায়ের দোকানে বসে সিগারেট টানছে। চায়ের দোকানের বেড়ায় লেখা- 'ভালো হয়ে যা মাসুদ'। লেখার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে মাসুদ। এমনভাবে টানছে যেন সিগারেটে আগুন ধরে যাবে এমন অবস্থা। সব রাগ যেন সিগারেটের উপর দিয়ে যাচ্ছে।]

শফিক : হ্যালো মাসুদ ভাইয়া, আমি শফিক। ভাইয়া ভালো আছেন ভাইয়া? আপনি কোথায় ভাইয়া?

মাসুদ : এইতো এলাকায়।

শফিক : ওহ। আপনার আজকে অফিস নেই ভাইয়া?

মাসুদ : না।

শফিক : আপনার নামে তো অনেক অভিযোগ ভাইয়া। আপনি নাকি আদালত অবমাননা করেছেন। একটা ফয়সালা হবার দরকার আছে না? আমরা পার্কে আছি সবাই। আপনি কি একটু আসবেন ভাইয়া? নাকি আমাদের বাসায় আসতে হবে?

মাসুদ : আসছি। সবাই আছিস তো?

শফিক : জি ভাইয়া। সবাই আছে।

মাসুদ : থাক আসতেছি।

শফিক : হাউ সুইট! উম্মাহ্।

[ফোন কেটে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে]

শফিক : আইতাছে হালায়।

[সিগারেট শেষ করে লেখার উপরে ধামাধাম কয়েকটা লাথি বসিয়ে দেয় মাসুদ। দোকানদার ভয়ে সেঁটিয়ে যায়।]

দৃশ্য-৩২

বাহির-দিন-পার্ক (মাসুদের বন্ধুরা)

[পার্কে বসে আছে সবাই।]

অনিক : মাসুদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে?

সজিব : ডিল হবে ডিল। আ বিগ ডিল। বহু জরিমানা দিছি। কিন্তু এই শালারে কোনোদিন খসাইতে পারি নাই।

অনিক : কিরকম ডিল হবে?

জুনায়েদ : চড় কুকরি মুকরি যামু। সব খরচ ওর। রাজি না হইলে...

সজিব : এই আইতাছে। কিরে ভাই ওর হাতে দেখি লাঠি।

[সবাই বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায়]

জুনায়েদ : মারবে নাকি?

[কাছাকাছি এসেই মাসুদ লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে। সবাই যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। পাশেই বসে ছিল এক পাগল তার কাছে দৃশ্যটা খুব মজার মনে হয়েছে। সে খুব খুশি। হাসছে আর হাত তালি দিচ্ছে। মাসুদ তাদের ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে এসে পাগলটার পাশে বসে। পাগলটা তার পকেট থেকে একটা বিড়ি (আকিজ) বার করে মাসুদকে দেয়। মাসুদ বিড়িটা ধরিয়ে টানতে থাকে।]

দৃশ্য-৩৩

বাহির-দিন-গলি (মাসুদ)

[দেয়ালে দেয়ালে লেখা 'ভালো হয়ে যা মাসুদ',। মাসুদ উদভ্রান্তের মতো একটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর যেখানেই দেয়াল লিখন দেখে ধুলা-বালি দিয়ে মোছার চেষ্টা করে। পথচারীরা দেখে আর মুচকি মুচকি হাসে।]

'আমার নাটকে নাটকই প্রাধান্য পেয়েছে, গীতলতা বা কাব্যালুতা নয়। মূলত দৈনন্দিনের গদ্যকে আমি জীবনের নিগূঢ় প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই। আমার সংলাপরীতিকে আমি চরিত্রের উল্লাস ও বেদনাপ্রবাহের সঙ্গে একীভূত করতে চাই।' *–নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন।*

-সমাপ্ত-

সংবাদপত্র

দিন-সকাল-বাসা করিমজান বিবি {দাদী (৬০)}, গল্প {নাতি (২২)}, ছড়া{নাতনী (১৮)}, সাইফ {নাতি (১৬)}, আমেনা {পুত্রবধূ (৪৫)}

[বাসা। ড্রইং রুম। একটি টেবিল। টেবিলের দুই দিকে সোফা। টেবিলের উপরে একটি পানপাত্র। একটি দৈনিক পত্রিকা। টেবিলের সাথে ভর দিয়ে রাখা হাঁটার একটি ছড়ি/লাঠি। দাদী করিমজান বিবি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পান চিবাচ্ছে আর ছরতা দিয়ে সুপারি কাটছে। তার পাশে বসে ফোনে গেমস খেলছে নাতী সাইফ। সাইফকে উদ্দেশ্য করে করিমজান বিবি স্নেহের স্বরে বলে-]

করিমজান বিবি : ক্ষুধা লাগছে দাদু?

[মূক সাইফ মাথা ঝাকিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে করিমজান বিবি রান্নাঘরে তার পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বলে-]

করিমজান বিবি : বউ। ও বউ নাশতা হইতে আর কতক্ষণ লাগবে? সাইফের ক্ষুধা লাগছে।

[ভিতর থেকে পুত্রবধূ জবাব দেয়]

পুত্রবধূ : এইতো আম্মা। আর ১০ মিনিট। আপনি ওষুধ খাইছেন?

করিমজান বিবি : ওহ ওষুধ। ছাতা, মনেই থাকে না।

[পুত্রবধূ এসে শাশুড়ীকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ফের রান্না ঘরে ছুট দেয়। গোসল সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ড্রইং রুমে ঢোকে গল্প। সে একটি চেয়ারে বসে তোয়ালেটা কাঁধের উপর ফেলে রেখে পত্রিকাটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। তাকে দেখেই দাদী করিমজান বিবি বিদ্রুপ শুরু করে।]

করিমজান বিবি : ছেরিদের মত কতগুলো চুল রাখছে। কেমন দেখায়! মন চায় আগুন ধরিয়ে দেই।

[গল্প দাদীর সাথে মস্করা করে গান ধরে]

গল্প : জ্বালাইলে যে জ্বলবে আগুন নেভানো বিষম দায়, আগুন জ্বালাইস না আমার গায় রে...

[রুমে ঢোকে ছড়া। সে মহা বিরক্ত বড় ভাই গল্পের উপর। সে এসেই মারমুখি ভঙ্গিতে গল্পকে জিজ্ঞেস করে-]

ছড়া : এই তুই আমার শ্যাম্পু নিছছ ক্যান?

[গল্প ডিরেক্ট অস্বীকার করবে]

গল্প : কে তোর শ্যাম্পু নিছে? আন্দাজে!

ছড়া : নিসনি তুই?

গল্প : এই যাহ।

[ছড়া জানে সে-ই নিছে। কিন্তু যেহেতু হাতে নাতে ধরতে পারেনি এখন সে জীবনেও স্বীকার করবে না। ছড়া ফুসছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। একটু পর সে আঙ্গুল তুলে থ্রেটের সুরে বলে-]

ছড়া : আর যদি কখনো তুই আমার কোনো কিছু ধরিস তাইলে তোর খবর আছে।

[গল্প ছড়ার থ্রেটকে পাত্তাই দেয় না। ছড়া এবার অন্যভাবে এটাক করে]

ছড়া : এই তোর লজ্জা করে না মেয়েদের পারফিউম লাগিয়ে বাইরে যেতে?

[গল্প এবার একটু লজ্জা পায়। সে ছড়াকে কথা না বাড়িয়ে চলে যেতে বলে-]

গল্প : এই যা সর সর...

[ছড়া মায়ের কাছে গিয়ে বিচার দেয়।]

ছড়া : মা মা...। আমার কোনো জিনিস যেন কেউ না ছোঁয়। আমি কিন্তু আগুন ধরিয়ে দিব, স্রেফ আগুন ধরিয়ে দিব।

গল্প : জ্বালাদো সারে ঘর।

[গল্প ফের পত্রিকার দিকে মনযোগ দেয়। একুট পরে দাদী গল্পকে উদ্দেশ্য করে বলে-]

করিমজান বিবি : এই কি পড়ছিস? একটু জোরে পড়, শুনি।

গল্প : তুমি শুনে কি করবে?

করিমজান বিবি : আহা! পড়না শুনি।

গল্প : সময় নেই।

[করিমজান বিবি নাতিকে ধমক দেয়]

করিমজান বিবি : তোকে পড়তে বলছি...

[গল্প এবার জোরে জোরে পড়তে শুরু করে হেডলাইনগুলো। ফ্রন্ট পেজের লিড নিউজটি পড়ে সে।]

গল্প : বাড়ছে রোমহর্ষক খুন; ৫ বছরে সারা দেশে ১৬ হাজার ৯৭৪টি খুন

৩ হাজার ৫৩৯ জন শুধু ২০২০ সালেই

[খুনের সংখ্যা শুনে মুখ হা হয়ে যায় দাদীর। ফ্রন্ট পেজের নিচেড় অংশের নিউজটি পড়ে এবার গল্প।]

বাড়ছে গুমের মিছিল; গত ১০ বছরে গুম হয়েছে ৬০৩ জন

এর মধ্যে ফিরে এসেছে ৩৬৯ জন আর লাশ উদ্ধার হয়েছে ৮১ জনের

[গুমের সংখ্যা শুনে মুখের হা বড় হয়ে যায় দাদীর। এরপর পত্রিকা উল্টে ব্যাক পেজের ব্যাক লিড পড়ে গল্প]

মাদ্রাসায় বলাৎকার মহোৎসব;

গত ১৫ মাসে ধর্ষণের শিকার ৬২ ছেলেশিশু, মৃত্যু ১৪

[সংবাদ শুনে দাদী অবাক বনে যায়।]

করিমজান বিবি : মাদ্রাসায়!

[গল্প হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে আবার পড়তে শুরু করে। ব্যাক পেজের নিচেড় অংশের নিউজ]

পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারী ও শিশু ধর্ষণ;

১ বছরে ধর্ষণের শিকার ১৩২১ নারী, ধর্ষণের পর হত্যা ৪৭ জনকে

শিশু ধর্ষিতের সংখ্যা ৮১৮, ১৪ মেয়েশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা

১ বছরে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাজারের বেশি মানুষ

করিমজান বিবি : দেশের এই অবস্থা!

গল্প : অবস্থার দেখছ কি? তুই তো শুধু পান চিবোতে পারিস রাখিস কিসের খোঁজ।

[পৃষ্ঠা উল্টে ভেতরের পৃষ্ঠায় চলে যায় গল্প। এরপর একটার পর একটা নিউজ পড়তে থাকে। একপাতা শেষ হলে আরেক পাতায় যায়।]

-ফেসবুক পোস্টে ‘হা’ ‘হা’ রিয়্যাক্ট দেয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

-রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরে ছুরি-বটি দিয়ে কুপিয়ে মাকে হত্যা করে মাদকাসক্ত ছেলে

-গাজীপুরে পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে শিশু শ্রমিককে হত্যা

-কন্যা সন্তান হওয়ায় আছার দিয়ে সদ্যজাত শিশু সন্তানকে হত্যা করল পাষণ্ড বাবা

-পটুয়াখালীতে চোখে টর্চের আলো মারায় বন্ধুকে খুন করে বন্ধু

-পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কামরুল ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী শিপাকে গলা কেটে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের মামা

-নরসিংদীতে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

-পুলিশ অফিসার বাবা ও মাকে হত্যা করে নেশা আসক্ত মেয়ে

-খুলনায় তরুণীকে ধর্ষণের পর গলা কেটে হত্যা, মৃতদেহকেও ধর্ষণ করে দুই পাষণ্ড

-প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণ, সাবেক উপসচিব গ্রেফতার

-দুই শিশু ধর্ষণের অভিযোগে ৭০ বছরের বৃদ্ধ গ্রেফতার

-চারতলা থেকে শিশুকে ছুঁড়ে ফেলল মা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু

-ঘটনা গোপন রাখতে ছাত্রকে কোরআন ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেফতার

-ছাত্রীকে নোট দেয়ার কথা বলে বাসায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ, শিক্ষক গ্রেফতার

-আফগানিস্তানে বাবা কর্তৃক ১০ বছর ধরে মেয়ে ধর্ষিত; হয়েছে দুটো সন্তানও!

-সৌদি আরবে ভাই কর্তৃক বোন ধর্ষণের শিকার

-ময়মনসিংহে বাবা কর্তৃক এক মেয়েকে হত্যার ভয় দেখিয়ে দিয়ে অন্য মেয়েকে ধর্ষণ

-বাবার দ্বারা অন্তসত্বা মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন বাবা

[গল্প এক নাগারে পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে আর পড়ছে। এদিকে নৃশংস সংবাদগুলো শুনছে আর ক্রমেই হার্টবিট বাড়ছিল দাদীর। আফগানিস্তানের সংবাদটা শোনার পরই তার বুকে ব্যাথা ওঠে। সে বুকে হাত দেয়। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গল্পের সেদিকে খেয়াল নেই, সে পড়েই যাচ্ছে। আর সাইফও বসে বসে মোবাইল টিপে যাচ্ছে। শেষ সংবাদটা পড়া অবস্থায় দাদী এলিয়ে পরে যায়। গল্প চিৎকার দিয়ে তার মাকে ডাকে। চিৎকার শুনে মা আর ছড়া দৌড়ে ঘরে ঢোকে। এসে এই অবস্থা দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে পরে। মায়ের ধমক খেয়ে গল্প দৌড়ে চলে যায় এম্বুলেন্স ডাকতে। পরে দাদীকে ধরাধরি করে মা আর ছড়া ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। একটু পরে এ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শোনা যায়।]

‘পৃথিবীর জীবন নামক নাট্যমঞ্চে সবাই একেকজন অভিনেতা/অভিনেত্রী। শুধুমাত্র চরিত্রগুলো ভিন্ন।’ *–উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।*

-সমাপ্ত-

অভিলাষ

দৃশ্য -১

[বস্তি। টিনের চালার ঘর। ঘর থেকে হাজিতে করে সবজি (টমেটো, গাজর, আলু ইত্যাদি) বস্তির সামনের রাস্তায় রাখা নিজের ভ্যানে তুলছে জাকির মিয়া। জাকির সবজি ব্যবসায়ী। সে এক-একবার আসছে আর হাজিতে সবজি ভরে নিয়ে ভ্যানে তুলছে। ভ্যানে করে শহরের অলিতে গলিতে সবজি বিক্রি করে সে। হাজিতে করে ঘর থেকে সে একবার গাজর নিয়ে ভ্যানে তোলে। ফিরে এসে টমেটো। আবার আলু। এদিকে জাকিরের বউ শেফালী তার মেয়েকে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত করছে। রংচটা স্কুল ড্রেস। মেয়ের চুল আঁচরে দিচ্ছে শেফালী। চিড়ুনিতে হালকা জট বাঁধলে মেয়েকে বকে ওঠে শেফালী]

শেফালী : কি অবস্তা দ্যাহো! ইট্টু ত্যাল পানি নাই, আল্লাহ! নাইররা কইররা দিমুহানে হেলে এক্কালে ভালো অইবে।

[কণা তার মার কথার প্রতিবাদ জানায়। তার স্বপক্ষে বাবাকে আশা করে]

কণা : না। বাবা!

শেফালী : তোর বাফে কি করবে? হ্যারেও নাইররা কইররা দিমু।

[জাকিরের ভ্যানে মাল তোলা শেষ। সে ব্যবসায় বের হবে। পথে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিবে। সে তাড়া দেয় মা-মেয়েকে।]

জাকির : কই, কতক্ষণ লাগবো?

[জাকিরকে উদ্দেশ্য করে বলে]

শেফালী : এইতো অইচে।

[এরপর মেয়ের স্কুল ব্যাগে বইপত্র ঢুকিয়ে দেয়। ব্যাগের চেনটা আটকাতে গেলে সেটা ছিড়ে যায়।]

শেফালী : আহ! ধ্যাত্তিরি!

কণা : এখন?

[কণা ছেড়া চেন এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মেয়ের মনের অবস্থা দেখে শেফালী বলে-]

শেফালী : সমেস্যা নাই, ঠিক করা যায়। মুছির দোহানে নিয়া গ্যালিই ঠিক কইররা দেবে।

কণা : না। নতুন ব্যাগ কিনে দিবা।

শেফালী : হয়! নতুন ব্যাগ লাগবে ওনার! পিডের উফরে দিমু নতুন ব্যাগ।

[শেফালী কয়েকটি সেফটি পিন দিয়ে ব্যাগের মুখটা কোনো রকমে আটকে দেয়। বাহির থেকে জাকিরের কণ্ঠ শোনা যায়।]

জাকির : কই কতদূর?

শেফালী : এইতো অইচে।

[মেয়ের কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দিয়ে শেফালী বলে-]

শেফালী : যা।

[জাকিরকে উদ্দেশ্য করে শেফালী বলে-]

শেফালী : ব্যাগের চেইনডা ছিররা গ্যাছে। টেইলারে অথবা মুছির দোহানে নিয়া ইট্টু ঠিক কইররা আইন্নেন।

জাকির : অহন সময় নাই। ছুটির পর।

[কণার মুখ ভার। ঘর থেকে বের হয়ে বাবার হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটার সাথে সাথে ছেড়া অংশ একটু ফাঁক হচ্ছে আবার বুজে যাচ্ছে।]

দৃশ্য -২

[জাকির সবজির ভ্যান নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। প্যাডেল দিচ্ছে। তার কোলের সামনে রডের সাথে বাঁধা কাঠের আসনে বসে আছে কণা।

কণা : আম্মু ব্যাগটা ছিড়ে ফেলছে।

জাকির : ইচ্ছে করে করে নি বাবা। ছিড়ে গেছে।

কণা : আমাকে একটা নতুন ব্যাগ কিনে দিবা তুমি। সুন্দর ব্যাগ।

জাকির : দিব বাবা।

কণা : কবে দিবা?

জাকির : দিব মা।

কণা : কবে?

জাকির : আগামী মাসে।

কণা : প্রমিস?

জাকির : প্রমিস মা।

কণা : থ্যাংক ইউ।

জাকির : আচ্ছা মা।

কণা : আচ্ছা না, ওয়েলকাম বলো।

জাকির : ওয়েলকাম মা।

[কথা বলতে বলতে স্কুলের গেটের সামনে গিয়ে থামে ভ্যান। জাকির কণাকে নামিয়ে দেয়। কণা হাত নেড়ে টা টা দিয়ে গেট দিয়ে স্কুলের ভিতরে ঢুকে ছুট দেয় ক্লাসের দিকে। কণা স্কুলে ঢুকে গেলে জাকির আবার ভ্যানে উঠে বসে। ভ্যান নিয়ে সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।]

দৃশ্য -৩

[জাকির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এক বাসার বেলকুনি থেকে এক মহিলা তাকে ডাকে।]

মহিলা : এই সবজি।

[ডাক শুনে জাকির ভ্যান থামায়। উপরে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে]

জাকির : কি লাগবো আপা?

মহিলা : আলু কত?

জাকির : কত কেজি নিবেন আপা?

মহিলা : কত করে?

জাকির : ৩০ টাকা আপা।

মহিলা : ২ কেজি নিব। ৫০ টাকা রাখবা।

জাকির : না আপা। সবজায়গায়ই ৩০ টাকা।

মহিলা : না। পচিশ করে রাখবা।

জাকির : আচ্ছা আপা ৫ টাকা কম দিয়েন।

মহিলা : না না। ৫০ টাকা হলে ২ কেজি দাও।

[আলু মাপতে শুরু করে জাকির। আর বলে-]

জাকির : ঠক হয়ে যায় আপা।

মহিলা : আরে ঠক হবে না।

জাকির : আর কিছু লাগবো না আপা? টমেটো আছে।

মহিলা : না, টমেটো আছে বাসায়।

[জাকির আলু মেপে দেয়। উপর থেকে রশি ঝুলিয়ে ব্যাগের ভিতরে টাকা দেয় মহিলা। জাকির টাকা নিয়ে ব্যাগের ভিতরে আলু দিয়ে দেয়।]

দৃশ্য -৪

[স্কুল ছুটি। ঘণ্টা বাজে। আজ একটু আগে ছুটি হয়েছে। সব ছাত্রছাত্রী বের হয়ে যায়। সব ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যাগের দিকে চোখ কণার। কার ব্যাগ কেমন। কোনটা সুন্দর। কোনটা বেশি সুন্দর। কোন ধরনের ব্যাগ সে কিনবে এই তার ভাবনা। সবার সাথে সাথে কণাও বের হয়ে যায় স্কুল থেকে। গেটের বাইরে বাবাকে না দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে একাই বাড়ির পথ ধরে। পথে একটি ব্যাগের দোকান পরে। সে দোকানের বাহিরে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ দেখতে থাকে। নানা রকমের ব্যাগ। তার নজর স্কুল ব্যাগের দিকে। তার চোখ লাফাতে থাকে। এই ব্যাগ থেকে ঐ ব্যাগ। হঠাৎ একটি ব্যাগে তার চোখ আটকে যায়। ব্যাগটার দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দোকানের ২০/২২ বছরের এক কর্মচারী বিষয়টা লক্ষ করে। সে কণাকে হাত নেড়ে বলে-]

কর্মচারী : হাই

[কণাও তাকে হাই দেয়।]

কণা : হাই।

[কর্মচারী তাকে ইশারায় ভিতরে ডাকে। কণা মাথা নেড়ে ভিতরে যেতে নারাজি জানায়। এর মধ্যে তার বাবাও চলে আসে। তাকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার পেছনে গিয়ে ডাক দেয়।]

জাকির : মা। স্কুল কখন ছুটি হলো?

কণা : এইতো একটু আগে। আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে।

জাকির : ওহ। এখানে কি করছ?

কণা : ব্যাগ দেখতেছি। বাবা দেখো ঐ ব্যাগটা কত সুন্দর!

[কণা হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়]

কণা : ঐ ব্যাগটা নিব।

জাকির : আচ্ছা মা। এখন না। পরে।

কণা : একটু দেখে যাই?

জাকির : দেখবা?

দৃশ্য -৫

[জাকির কণাকে নিয়ে দেকানে ঢোকে। দোকানে সাদা কাগজে প্রিন্ট করে লেখা "একদর" ।]

জাকির : কোনটা মা?

কণা : ঐতো ঐটা।

[কর্মচারীকের ব্যাগটা দেখাতে বললে কর্মচারী ব্যাগটা নামিয়ে দেয়]

জাকির : ভাই এখন কিন্তু নিব না। পরে নিব। এখন শুধু একটু দেখব।

কর্মচারী : দেখেন সমস্যা নাই।

[কর্মচারী আগের ব্যাগটা মেয়ের কাঁধ থেকে খুলে নতুন ব্যাগটা পরিয়ে দেয় ।]

কণা : সুন্দর না?

জাকির : হুম, সুন্দর মা।

কর্মচারী : সুপার।

জাকির : দাম কিরকম ভাই?

কর্মচারী : ২১৫০

[দাম শুনে জাকিরের হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা নিমিষেই মলিন হয়ে যায় ।]

জাকির : ২১ শো ৫০?

[সে কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে]

জাকির : আপনাদের এখানে তো একদাম?

কর্মচারী : জি।

জাকির : আচ্ছা।

কণা : আমরা আগামী মাসে নিব।

কর্মচারী : ওকে।

[মেয়ের কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে একটু হাসে জাকির। এরপর দোকানদারের উদ্দেশ্যে বলে]

জাকির : আচ্ছা যাই ভাই।

[দু'জনে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়]

দৃশ্য -৬

[রাত। জাকির, শেফালী আর কণা শুয়ে আছে। কণা মাঝে। দু'জন দু'পাশে। কণা ঘুমাচ্ছে। শেফালি পাশ ফেরে শুয়ে আছে। জাকির মাথার নিচে হাত দিয়ে উপরে ঘরের চালার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছে। শেফালি পাশ ফিরে দেখে জাকির ঘুমাচ্ছে না। কি যেন ভাবছে।]

শেফালী : কি চিন্তা করতে আছেন?

[জাকির একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে]

জাকির : কিছু না।

[শেফালী এবার আরেকটু জোর দিয়ে বলে]

শেফালী : কি অইচে কন তো।

জাকির : কণা একটা নতুন ব্যাগ চাইছে। আইজকা দোকানে একটা ব্যাগ পছন্দও করছে। দাম ২১৫০। একদাম।

শেফালী : এত টাহা দিয়া ব্যাগ কেনা লাগবে না। কিস্তি আছে ১৭০০ টাহা। রহিমার মায় পায় সাড়ে ছয়শ'। গত মাসের ঘড় ভাড়া বাহি।

জাকির : ব্যাগটা খুব পছন্দ করছে।

শেফালী : করুক। এত আল্লাদ ভালো না। "ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম। ভাত খাইতে পারে না চা খায়। সাইকাল লইয়া বাথরুমে যায়।"

[রাগত স্বরে এই বলতে বলতে আবার পাশ ফেরে সে।]

শেফালী : দ্যাড়শ' টাহায়ও অনেক সুন্দার সুন্দার ব্যাগ পাওন যায়। একটা কিন্না দিও।

[এই বলে চোখ বোজে সে। জাকিরের মুখটা শেফালীর দিকেই ফেরানো ছিল। সে ঘাড়টা ঘুড়িয়ে ফের ছাদের দিকে তাকায়।]

দৃশ্য -৭

[রাস্তার পাশে ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে জাকির। এক পথচারী এসে টমেটুর দাম জিজ্ঞেস করে-]

পথচারী : কত টমেটু কত?

জাকির : ৩০ টাকা।

[পথচারী টমেটো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলে]

পথচারী : হ ৩০ টাহা! আইছে! ৩০ টাহা টমেটু আছে এহন? ১৫ টাহা কইররা রাক। হেলে ২ কেজি দে।

জাকির : হ মাগনা আনছি না!

পথচারী : মাগনা আনছো না চুরি কইররা আনছো হোনতে চাইছি? ১৫ টাহা কইররা দেলে ২ কেজি দে।

জাকির : না ভাই পারুম না। কিনতেও পারি নাই।

পথচারী : ২ কেজি ৩৫ টাহা দিমুহানে। দ্যাক।

জাকির : না ভাই হইবো না।

[পথচারী রওনা দেয়। এই সময় জাকির টিটকারি মেরে বলে]

জাকির : আইছে, ১৫ টাকায় টমেটো কিনতে। খাইয়া মরতে অইবো না।

[টিটকারিটা শুনে ফেরে পথচারী। সে রেগে যায়। ফিরে এসে বলে]

পথচারী : এই কি কইছো?

জাকির : কিছু না।

পথচারী : কিছু না মানে! কি কইছো তুই?

জাকির : কিছু কই নাই ভাই। যান তো।

[এই বলে জাকিরই ভ্যান নিয়ে রওনা হয়। পথচারী তার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।]

দৃশ্য -৮

[স্কুল ছুটি হলে প্রতিদিনই সেই দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কণা। ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে থাকে। দোকানে লোকজন থাকলে ঢোকে না। লোকজন না থাকলে ঢোকে। কর্মচারীর সাথে তার একটা ভাব হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সে ব্যাগটা পরে আয়নার দিকে তাকিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে। কর্মচারী তার ছবি তোলে। ছবি আবার কণাকে দেখায় তাকে কেমন মানিয়েছে।]

দৃশ্য -৯

[একদিন দোকানে এক কাস্টমার আসে। সে তার মেয়ের জন্য কণার পছন্দ করা ব্যাগটা পছন্দ করে। সে ব্যাগটা নিতে চায়। কিন্তু কর্মচারী ব্যাগটা বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়।]

কর্মচারী : এটা ভালো হবে না। আপনাকে তো আর খারাপ জিনিস দিতে পারব না।

[এই বলে সে অন্য ব্যাগ দেখায়]

কর্মচারী : এটা দেখেন। অরিজিনিয়াল লেদার। কালার আছে ৩ টা।

[দোকান মালিক কর্মচারীর কর্মকাণ্ড শুধু দেখতেছিল আর ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কাস্টমার পরে অন্য একটা ব্যাগ পছন্দ করে নিয়ে যায়। কাস্টমার চলে যাবার পর সে কর্মচারীকে বলে]

দোকান মালিক : কি হইছে এই ব্যাগের?

কর্মচারী : কিছু হয় নি। এটা একজন পছন্দ করে গেছে। পরে এসে নিবে।

দোকান মালিক : পরে এসে নিবে তার গ্যারান্টি কি?

কর্মচারী : না, নিবে।

[দোকান মালিক বিরক্ত হয়ে বলে]

দোকান মালিক : বেচাকেনার দরকার নাই। মাল দোকানে ফেলে রাখ।

দৃশ্য -১০

[এর মধ্যে কয়েকদিন ছুটিতে ছিল কর্মচারী। ছুটি কাটিয়ে সে ফিরে আসে। সাথে একটা বড় ব্যাগ। ব্যাগ নিয়ে দোকানে ঢুকেই সে মালিককে সালাম দেয়।]

কর্মচারী : স্লামালাইকুম।

মালিক : গেলি ২ দিনের কথা বলে কাটিয়ে আসলি ৪ দিন।

[কর্মচারী ছুটিতে থাকা অবস্থায় এক কাস্টমারের কাছে ব্যাগটা বিক্রি করে দেয় দোকান মালিক। দোকানে ঢুকেই তার চোখ চালে যায় ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে। দেখে সেখানে অন্য একটি ব্যাগ। তার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। দোকানদারের অনুযোগ তার কানে ঢুকছে না। সে দোকান মালিককে জিজ্ঞেস করে।]

কর্মচারী : ঐ ব্যাগটা?

দোকান মালিক : কোন ব্যাগটা?

[কর্মচারী বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলে দোকান মালিক ভ্রু কুচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলে-]

দোকান মালিক : বিক্রি হয়ে গেছে।

কর্মচারী : বিক্রি করে দিছেন মানে! ওটাতো গোডাউনেও নেই। এক পিসই ছিল।

দোকান মালিক : বিক্রি করমু না মানে!

[কর্মচারী সেন্টিমেন্টাল হয়ে যায়। রেগে যায় মালিকের উপর।]

কর্মচারী : আপনারে না বলছি ওটা বিক্রি করা যাবে না।

দোকান মালিক : এই তুই এভাবে কথা বলছিস কেন? এই বেয়াদবের বাচ্চা। বিক্রি করা যাবে না মানে কি? ১০/১২জন কাস্টমার ফিরিয়ে দিয়েছি। মালিক কে তুই না আমি? পুঁজি খাটাইছে কে তোর বাপ? তামাশা শুরু করছস? ঘাড় ধরে বের করে দিব একদম।

[কর্মচারী কথাগুলো শুনছিল আর রাগে ফুসছিল। আস্তে করে সে বের হয়ে যায় দোকান থেকে।]

দোকান মালিক : এই কই যাস?

কর্মচারী : করলাম না আপনার চাকরি। আপনার মত কঞ্জুসের চাকরির উপরে আমি পেসাব করি।

[দোকান মালিক তেড়ে বের হতে হতে বলে]

দোকান মালিক : এই কি কইলি?

[কর্মচারী দোকান থেকে বের হয়ে দৌড় দেয়। আর কি কি যেন বলতে থাকে দোকান মালিককে উদ্দেশ্য করে।]

দোকান মালিক : তোর ঠ্যাং যদি আমি না ভাংছি!

[ফিরে এসে দোকানে বসে রাগে ফুঁসতে থাকে দোকান মালিক]

দৃশ্য -১১

[জাকির শুয়ে আছে। চিন্তা করছে। কণা ঘুমাচ্ছে।]

শেফালী : ঘুমান না ক্যা?

[জাকির ছাদের দিকে তাকিয়ে]

জাকির : মেয়েটা একটা আবদার করছে তাও রাখতে পারতাছি না। কেমন বাপ হইলাম!

[শেফালী বিরক্ত গলায় বলে]

শেফালী : আচ্ছা চিন্তা করেন। ঘুমানের দরকার নাই।

[এই বলে সে পাশ ফিরে শোয়। কয়েক মুহূর্ত এভাবেই কাটে পরক্ষণেই শেফালী উঠে পরে। উঠে বাতি জ্বালায়]

জাকির : কি?

শেফালী : আমহের ধারে কয় টাহা আছে?

[জাকির উঠে বসে]

জাকির : পুঁজির টাকা বাদ দিলে সাড়ে নয়শ'র মতো। ক্যান?

শেফালী : এদিকে দ্যান।

জাকির : ক্যান?

শেফালী : দেতে কইছি দ্যান।

[জাকির বিছানা ছেড়ে উঠে শার্টের পকেট থেকে টাকা বের করে শেফালীকে দেয়। শেফালী বালিশের কভারের চিপা থেকে ভাঁজ করা মোড়ানো কিছু টাকা বের করে। এরপর গুণতে থাকে।]

জাকির : টাকা পেলে কোথায় তুমি?

[শেফালী ঘরের মেঝেতে বসতে বসতে বলে]

শেফালী : মাঝে মাঝে আমহের পকেট দিয়া কিছু টাহা আরায় না?

[জাকিরও বসতে বসতে বলে]

জাকির : ও তুমিই সেই চোর?

শেফালী : এই চোর কইবেন না।

[শেফালী বটা টাকার ভাঁজ খুলতে থাকে। খোলা হলে গুণতে শুরু করে। মোট ১৪২৫ টাকা]

শেফালী : ১৪২৫। ব্যাগের দাম কত ২১০০ না??

জাকির : ২১৫০।

শেফালী : ২০০০ টাহায় দেবে না?

জাকির : না। একদামের দোকান।

[শেফালী একটু হতাশ ভঙ্গিতে বলে]

শেফালী : ওহ। ...তয়হেলে আর লাগে কত?

[জাকির হিসাব করে বলে]

জাকির : ৮৫০। কিন্তু রহিমার মা যে ৬৫০ টাকা পায়।

শেফালী : হেডা বুজমুহানে। রহিমার মা খ্যাচখেইচ্চা অইলেও মানুষ খারাপ না। বুজাইয়া কইলে বোজবে।

জাকির : এখনো তো ৮৫০ টাকায় টান।

[কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকে দু'জনে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় শেফালী। চৌকির নিচ থেকে সে মাটির ব্যাংকটা বের করে। উঁচু করে ভাঙতে নিবে তখন জাকির বলে]

জাকির : আহা! করো কি? করো কি? তোমারে কহনো কিছু দিতে পারি নাই।

শেফালী : আমার চেন লাগবে না।

[বলেই ব্যাংটা ভেঙে ফেলে শেফালী। ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে পরে ১/২/৫ টাকার কয়েন। ২/৫/১০/২০/৫০/১০০/ টাকার নোট]

[জাকির, শেফালী ও কণা আসে দোকানে। এসে শোনে ব্যাগটা বিক্রি হয়ে গেছে। বিমর্ষ হয়ে সবাই ফিরে আসে। সবার মুখ মলিন। কণার চোখ বেয়ে পানি ঝরছে।]

দৃশ্য -১২

[কণা ঘুমাচ্ছে। জাকির ডালায় পেঁয়াজের আলগা খোলস ঝাড়ছে। শেফালী ঘরের মেঝেতে পরে থাকা ভাঙা মাটির ব্যাংকের টুকরো অংশগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় করছে ফেলে দিবে বলে। এমন সময় দরজায় নক।]

শেফালী : কে?

[শেফালী গিয়ে দরজা খোলে। দরজা খুলেই দেখে দোকান মালিক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ব্যাগ। তাকে দেখে জাকিরও উঠে দাঁড়ায়। দোকান মালিককে একটি চেয়ার দেয় বসার জন্য। মাটির ব্যাংকের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে চোখ পড়ে দোকান মালিকের।]

দোকান মালিক : কি ভাঙলো?

শেফালী : মাটির ব্যাংক। ভাঙ্গে নায়। নিজেই ভাংছালাম।

[শেফালীর মুখে সব কথা শুনে দোকান মালিক আবেগ আপ্লুত হয়ে পরে। সে ব্যাগটা কণার বালিসের পাশে রাখে।

দোকান মালিক : ব্যাগটা যার কাছে বিক্রি করেছিলাম সে আমার পরিচিত কাস্টমার। আপনারা দোকান থেকে ফিরে আসার পর খুব

খারাপ লাগছিল। ব্যাগটা আপনাদের মেয়ের জন্য আমার পক্ষ থেকে উপহার। দাম সেধে লজ্জা দিবেন না।

[কথাটা শুনে আনন্দে জাকির আর শেফালী একে অপরের দিকে তাকায়। দু'জনের চোখই ছলছল করে ওঠে। এ জল আনন্দের না কৃতজ্ঞতার বোঝা শক্ত।]

দৃশ্য -১৩

[বাবার সাথে ভ্যানে করে স্কুলে যায় কণা। তার পিঠে নতুন ব্যাগ। তার চোখে মুখে আনন্দের ছটা। স্কুল গেটের সামনে গিয়ে ভ্যান থামে। সে ভ্যান থেকে নেমে এক দৌড়। জাকির মেয়ের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়ের পিঠে ব্যাগটা কেমন শোভা পাচ্ছে তা দেখছে, নাকি মেয়ের আনন্দ দেখছে ঠিক বোঝা যায় না।]

'নিজের মুখ দেখতে কাচেড় আয়না ব্যবহার কর।

আর নিজের আত্মাকে দেখতে ব্যবহার কর শিল্পকর্ম।' *–জর্জ বার্নার্ড শ।*

-সমাপ্ত-

তেলকাণ্ড (রম্য রচনা)

দৃশ্য -১

[৫ লিটারের সয়াবিন তেলের একটি বোতল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে শফিক। তার সাথে সাথে হাঁটছে এক আধ পাগলা, মহল্লার ৮-১০টি বাচ্চা ছেলেপিলে। হাঁটছে আর কিছুক্ষণ পর পর তৃপ্তির চোখে বোতলের দিকে তাকাচ্ছে শফিক। হাতে ঝুলছে বোতল। বোতলের গলায় ফুলের মালা। পথিমধ্যে এক পথচারী দাম জিজ্ঞেস করে।]

পথচারী : কত হইছে ভাই?

[শফিক উৎসাহের সাথে দাম বলে।]

শফিক : হাজার পঞ্চাশ।

পথচারী : মাসাল্লাহ্। ভালো হইছে ভাই। জিতছেন।

[পথচারীকে ক্রস করে সামনে এগিয়ে যায়। কিছুদূর যাবার পর আরো এক পথচারী দাম জিজ্ঞেস করে]

পথচারী: ভাই কত হইলো?

শফিক: এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ভাই।

পথচারী: মাসাল্লাহ্। ভালো হইছে। এবছর কেটে যাবে ইনশাল্লাহ।

দৃশ্য -২

[বাড়ি ফিরলে দরজা খুলে শফিকের স্ত্রী আসমা স্বামীর হাতে তেলের বোতল দেখে আবেগে আত্মহারা হয়ে ওঠে। চিৎকার করে মেয়েকে ডাকে।]

আসমা : এ তাহী, দ্যাখ তো আব্বায় কি আনছে দ্যাখ।

[মায়ের ডাক শুনে ছুটে আসে তাহী।]

তাহি : ওয়াও! কত্তবড়!

আসমা : কত নিছে দাম?

শফিক : এক হাজার পঞ্চাশ।

আসমা : তয়হেলে তো কোমই নেছে।

[শফিকের মেয়ে তাহী এসে বাবার হাত থেকে বোতলটা নিতে চায়।]

শফিক : না মা না। পরে যাবে মা।

[স্ত্রীকে বোতলটা যত্নে আলমারিতে তালা মেরে রাখতে বলে। এরপর শফিক স্থানীয় মসজিদের ইমামকে ফোন দেয়।]

শফিক : আসসালামু আলাইকুম হুজুর।

[হুজুরের রেকর্ড ফয়েজ (ফোনের অপর পাশ থেকে, রেডিও ভয়েজ)]

হুজুর : ওয়া আলাইকুম আস সালাম।

শফিক : কতদূর হুজুর?

হুজুর : এইতো নামায শেষ করলাম মাত্র।

শফিক : তাড়াতাড়ি আসেন।

হুজুর : আসতেছি আসতেছি।

শফিক : আসেন। আসসালামু আলাইকুম।

[সালাম দিয়ে ফোন রেখে দেয় শফিক]

দৃশ্য -৩

[বাড়ির সামনে খোলা জায়গা। দুই তিন জন মিলে বোতলটাকে খুব আঁটগাট বেঁধে ধরে রেখেছে। বোতলের নিচে একটি বড় কড়াই রাখা। একটা গরু জবাইয়ের রাম দা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন হুজুর।]

শফিক : হুজুর শুরু করেন।

[হুজুর রাম দা তুলে বোতলের মুখে ধরে জবাই করার ভঙ্গিতে পোচ দিতে শুরু করে]

হুজুর : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

[বোতলের প্যাচ কেটে গিয়ে রক্ত পরার মত করে একটু তেল পরে নিচে কড়াইতে।]

দৃশ্য -৪

[শফিকের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে হুজুর ।]

হুজুর : শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ! রান্না ভালো হইছে মাসাল্লাহ। যাযাকাল্লাহি খাইরান।

[স্ত্রীকে একটু টিটকারি মারে শফিক]

শফিক : রান্না মাঝে মাঝে ভালো হয়।

[খোঁচা খেয়ে স্ত্রীও পাল্টা জবাব দেয়]

আসমা : ঐ শুরু অইছে।

[হুজুর একটু মুচকি হাসে তাদের কাণ্ড দেখে। এরপর জিজ্ঞেস করে-]

হুজুর : আচ্ছা, এই ৫ লিটার তেলে আপনাদের কতদিন যাবে?

শফিক : ঠিক মতো খরচ করতে পারলে এ বছর চলে যাবে ইনশাল্লাহ।

[আসমা প্রতিবাদ জানিয়ে ঠেস মারে শফিককে]

আসমা : উঁউউ আইছে! টাইন্না মাইন্না ৬ মাস যায় কি না সন্দেহ!

[এসময় ভিতরের ঘরে কিছু একটা পরার শব্দ হয়। সবাই সেদিকে তাকায়]

দৃশ্য -৫

[সবাই যখন খাচ্ছিল, বাচ্চা মেয়েটা তখন চুপি চুপি বালিশের নিচ থেকে চাবি নিয়ে আলমিরা খুলে বোতলটা নিয়ে খেলা শুরু করে। বোতলে চুমু খায়। আদর করে দেয়। মুখ খুলে তেলের গন্ধ শোকে। হঠাৎ হাত ফসকে বোতলটা পরে যায়। সে হতভম্ব হয়ে যায়। তেল গড়িয়ে যায় মেঝেতে। শব্দ শুনে সবাই দৌড়ে আসে এ ঘরে। এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি দেখে সবাই হা হয়ে যায়। কারো মাথায় হাত, কারো মুখে হাত। আর তাহি ভয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে-]

তাহি : তেল পইরা গেছে।

'জোড়পূর্বক হ্যাপি এন্ডিং এক প্রকার গোড়ামি। আমার মতে এই ধারণা শিল্পের সহজ-স্বাভাবিক-সোজা পথের স্পিড ব্রেকার।' *–ওবায়দুল হক বাদল*

-সমাপ্ত-

ঋণ

মূল ভাবনা: পল্লব বিশ্বাস

রচনা: ওবায়েদ-উল হক বাদল

[ডা. ইলিয়াস হোসেন। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সী রুস্তমকে দেখে কিছু টেস্ট আর প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ওষুধ লিখে দিলেন।]

ডা. ইলিয়াস : এই টেস্টগুলো করাতে হবে। টেস্টগুলো করে রিপোর্ট নিয়ে আসবেন। আর আপাতত এই ওষুধগুলো খাবেন।

[রুস্তম প্রেসক্রিপশনটা হাতে নেয়।]

রুস্তম : ছার, ভিজিট কতো?

ডা. ইলিয়াস : ভিজিট এক হাজার। কিন্তু আপনার জন্য পাঁচশো।

[রুস্তম অবাক হয় ডাক্তারের কথা শুনে]

রুস্তম : আমার জইন্যো পাশ্যো ক্যান ছার?

ডা. ইলিয়াস : আপনি না বললেন, আপনি ৮ নম্বর বাসের ড্রাইভার?

রুস্তম : জ্বি ছার।

ডা. ইলিয়াস : ৮ নম্বর বাসের কাছে আমি অনেক ঋণী। আমাদের বাসা ছিল কল্যাণপুরে। ঢাকা মেডিকেলে পড়তাম। বাসা থেকে ৮ নম্বর বাসে চড়ে শাহবাগ নামতাম, আবার ক্লাস শেষে শাহবাগ থেকে ৮ নম্বর বাসে চড়ে বাসায় ফিরতাম। কোনোদিন ফুল ভাড়া দেই নি। হাফ ভাড়া দিতাম। আর এ নিয়ে বাসের কন্ট্রাক্টরদের সাথে মাঝে মাঝেই অনেক বাকবিতণ্ডা হতো, কিন্তু শেষমেষ তারাও মেনে নিতো, আমরাও ওভাবেই চলতাম। আমার ডাক্তার হওয়ার পিছনে আপনাদের অনেক ভূমিকা আছে। তাই চেষ্টা করি মানুষের দেনা শোধ করার।

[কথাগুলো শুনছে আর মিটমিট করে হাসছে রুস্তম আলি। ক্ষণিকের জন্য ভাবনায় অতীতে চলে যায় রুস্তম আলী। ২০০০ সাল। ২৫ বছরের যুবক। চুল উস্কো-খুস্কো। বাসে ভাড়া তুলছে রুস্তম আলী। তার হাতের আঙ্গুলের ভাঁজে ভাঁজে নানা

অঙ্কের টাকার নোট। এক এক ফোঁকরে এক এক নোট ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০টাকা...। হাফ ভাড়ার যন্ত্রণায় রেগে গিয়ে রুস্তম আলী বাসের ছাদে থাপ্পর মেরে (সিঙ্গেল) দেয়]

রুস্তম আলী (কন্ট্রাক্টর) : ওস্তাদ গাড়ি থামান। গাড়ি যাইবো না।

ডা. ইলিয়াস (ছাত্র) : গাড়ি যাবে না মানে!

রুস্তম আলী (কন্ট্রাক্টর) : যাইবো না মানে যাইবো না।

[এক যাত্রী খেকিয়ে ওঠে]

যাত্রী : এই মিয়া কি শুরু করছ? যাবে না মানে কি। আমরা কি করব?

রুস্তম আলী : ৪০ টা সিট। ২০ টা হাফ ভাড়া। পোষায় না ভাই। আর পারুম না। গাড়ি যাইবো না।

ডা. ইলিয়াস (ছাত্র) : যাবি না মানে! তুই যাবি তোর বাপ যাবে।

রুস্তম আলী : আপ্নের বাপের গাড়ি নাকি? আপ্নের কথায় চলব?

[বাপ তুলে কথা বলায় ক্ষেপে যায় ইলিয়াস। সে কন্ট্রাক্টরের কলার ধরে বসে]

ডা. ইলিয়াস (ছাত্র) : কি বললি?

[একটা হট্টগোল। ধস্তাধস্তি। চেঁচামেচি। ধাক্কাধাক্কি। ...অতীত রমন্থন করছে আর মিটমিট করে হাসছে রুস্তম আলী।]

ডা. ইলিয়াস : কি ব্যাপার, আপনি হাসছেন কেনো?

রুস্তম : ছার, আমি আপনারে চিনছি। ২০০০ সালের দিকে ৮ নাম্বার বাসের কন্ট্রাক্টর আছিলাম আমি। আপনি তহন স্টুডেন। আমার বাসে পেরায়ই যাইতেন। আপনের লগে আমার একদিন তক্কাতক্কিও হইছে।

[রুস্তম আলীর কথা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ডা. ইলিয়াস।]

ডা. ইলিয়াস : কি বলেন? আপনি একথা এতক্ষণ বলেন নি কেনো?

রুস্তম আলী : বলি নায় কারণ, গরীবগোতো কেউ মনে রাহে না, চিনলেও চিনতে চায় না।

[ডা. ইলিয়াস চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রুস্তমকে জড়িয়ে ধরে বলে]

ডা. ইলিয়াস : মামা, তোমার ভিজিটতো লাগবেই না, আমি নিচে কাউন্টারে বলে দিচ্ছি যেন সর্বনিম্ন রেটে তোমার টেস্টগুলো করে দেয়। তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তুমি আমার মামা।

'জীবন শিল্পকে অনুসরণ করে না

করে বাজে টিভি প্রোগ্রামকে।' *–উডি এলেন*

-সমাপ্ত-

অর্থনৈতিক ব্যায়াম

দৃশ্য ১

[দুই ভাই বোন- ভাই জালাল (১০), বোন ময়না (৭)। স্কুল থেকে ফিরছে। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। অপরিস্কার জামা-কাপড়। উস্কো-খুস্কো চুল। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ময়না হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। বাইরে যে গ্রিল পোড়ানো হচ্ছে সেটা দেখছে। একটা ঢোক গেলে সে। জালাল ময়নার হাত ধরে টান দেয়।]

জালাল : খাওয়ামুহানে, কইছি না?

ময়না : তুই তো খালি কবিই।

জালাল : কইছি যহন একদিন না একদিন খাওয়ামুই।

[হাত ধরাধরি করে আবার হাঁটতে শুরু করে দুই ভাই-বোন।]

দৃশ্য ২

[সকালে রিক্সা নিয়ে বের হচ্ছে জালাল আর ময়নার বাবা সামছু। গত মাসে তার রিক্সাটা চুরি হয়ে যাবার পর ভাড়া রিক্সা চালায় সামছু। স্কুলে রওনা হইছে ময়না আর জালাল। বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জালাল আর ময়না। তারা কিছু একটা বলতে চায় বাবাকে। কিন্তু ভয় পাচ্ছে। পাছে বাবা রেগে যায়। রিক্সা চুরি হবার পর থেকে সামছু মিয়ার মেজাজ অত্যধিক গরম। জালাল আর ময়না একে অন্যকে খোঁচাতে থাকে। শেষে ময়নাই সাহস করে বাবার কাছে টাকা চায়।]

ময়না : বাবা ১০টা টাহা দেও।

[টাকার কথা শুনেই ময়নার বাবা ঝাড়ি মারে মেয়েকে।]

ময়নার বাবা : পেরতেকদিন টাহা লাগে!

[ঝাড়ি শুনেই জালাল ময়নার হাত ধরে টান দেয়। ফের ধমক খাওয়ার ভয়ে আবদার-টাবদার রেখে দ্রুত কেটে পরে।]

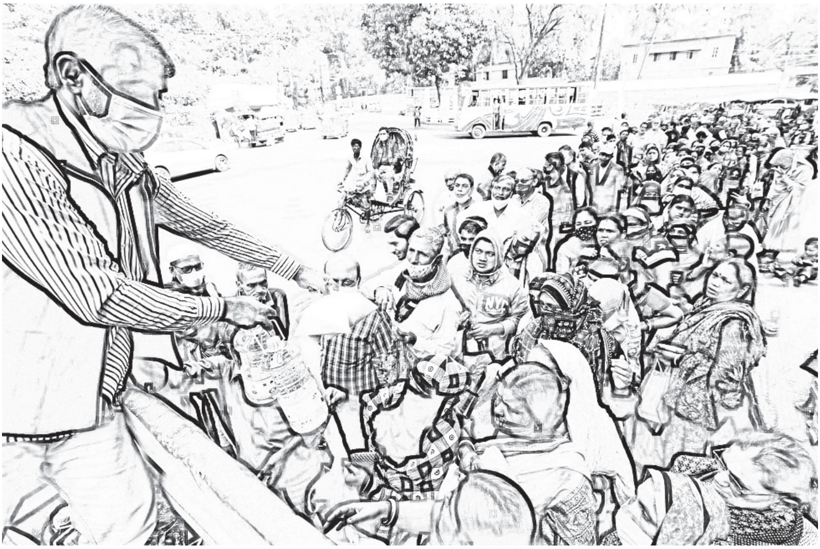

দৃশ্য ৩

[টিসিবির পিক-আপ এ পণ্য বিক্রি হবে। লোকজনের ভীর। যেখানে পিক-আপ থাকে সেখানে ফুটপাথে লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই যার যার লাইনের জায়গা করে রেখেছে রাস্তায় সিরিয়াল ধরে ব্যাগ ভাজ করে রেখে। ব্যাগ যেন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে না যায় সেজন্য ব্যাগের উপর সবাই ইট পাথরের টুকরো দিয়ে রেখেছে। বহু প্রতীক্ষার পর পিক-আপ আসে। পিক আপ যেখানে থামার কথা সেখানে না থেমে একটু সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় হুল্লোড়। সবাই তাদের ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে পিক-আপের পেছনে পেছনে ছুট দেয়। কে গিয়ে লাইনের সামনের দিকে দাঁড়াতে পারে সেই প্রতিযোগিতা। লাইন আর লাইন থাকে না। বেচা কেনা শুরু। স্কুল ফাঁকি দিয়ে জালাল আর ময়নাও লাইনে দাঁড়ায়।]

দৃশ্য ৪

[এক টিভি সাংবাদিক ও তার সঙ্গী ক্যামেরা ম্যান এসেছে নিউজ করতে। টিসিবির পণ্য বিক্রির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি নিউজ করার অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে তাদের।]

ক্যামেরাম্যান : ভাই এখানে তো সারাদিন লেগে যাবে।

সাংবাদিক : সারাদিন কেন লাগবে? আমার কাজ দেখিস নি আগে। ধর-মার-কাট। দ্যাখ শুধু কি করি!

[সাংবাদিক প্রথমে পিটিসি দেয়। চুল টুল ঠিক ঠাক করে ফোনের স্ক্রিনে চেহারাটা দেখে নিয়ে ক্যামেরাম্যানের উদ্দেশ্যে বলে]

সাংবাদিক : ঠিক আছে তো না?

[ক্যামেরাম্যান সায় দিলে পিটিসি শুরু করে]

সাংবাদিক : নিত্যপণ্যের বাজারে একযোগে দাম বেড়েই চলেছে প্রায় সব পণ্যের। কখনো পেঁয়াজের ঝাঁঝ অতিমাত্রায় বেড়ে যায় কখনো শুরু হয় তেলের তেলেস্মাতি। কখনো লবণ হয়ে যায় তেতো কখনো চিনি হয়ে যায় ঝাল। দিনকে দিন নিত্য প্রয়োজনীয় এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় নাভিশ্বাস উঠে গেছে ক্রেতাদের। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবন কাটছে কঠিন অর্থনৈতিক ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে। ...এই অবস্থায় কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে টিসিবির পণ্য। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করছে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এই মুহূর্তে আছি উত্তরা ১৪ নং সেক্টরে। কথা বলব লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন ক্রেতার সাথে।

ইন্টারভিউ ১-

এক মুরব্বি : ত্যালের দাম যেভাবে বাড়ছে ভাই! এহেনতে নিলে কয়ডা টেহা বাঁচবো, এই আরকি। কষ্ট হইলেও কিছুতো করার নাই।

ইন্টারভিউ ২-

এক ভদ্রলোক : ২০০ টাকা কেজি বিক্রি করছে দোকানে। আমাদের পক্ষে ২০০ টাকা দিয়ে কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। সবকিছুর দামইতো

বাড়তি। সবমিলিয়ে কিছু টাকাতো বেঁচে যায়। তবে চাহিদার তুলনায় পণ্য সরবারহ কম। সরবারহ আরো বাড়ানো উচিত।

ইন্টারভিউ ৩-

এক মহিলা : সব জাগায়ইতো দাম বাড়তি। সবকিছুর দামই অ্যারারতা দ্যারা। এহানে ইট্টু কোমে পাওন যায়। হেইফান্নে এহাইনদা নেই। রোদ্দুরে পুড়ি। কিন্তু মাজে মাজে খালি আহেই যাইতে অয়। হারাদিন খারাই থাইক্কা হুনি, মাল শ্যাষ। হেসোমায় কেমনডা লাগে কন!

ইন্টারভিউ ৪:

এক শিক্ষক : আর বইলেন না ব্যায়াম করছি, শারিরীক ও অর্থনৈতিক ব্যায়াম। জীবন মানেই ব্যায়াম।

[বোরকা পরা এক বৃদ্ধা কিছুই বলতে রাজি নন। সাংবাদিক তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি পর্দা রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পরেন। টানা ঘোমটা আরো টেনে দেন]

সাংবাদিক : আপনি এখানে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন? চাচি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? চাচি?

[পাশের একজন বলে- উনি পরপুরুষের সাথে কথা বলেন না।]

সাংবাদিক : চাচি, আমি আপনার ছেলের মতো।

[এবার বোরকা পরা বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বিরবির করে।]

বৃদ্ধা : ধুর। ব্যাডাগো লজ্জা সরম বলতে কিছু নাই।

[এই কথা শুনে হেসে ফেলে সাংবাদিক। তাকে ছেড়ে অন্য একজনের কাছে যায়।]

ইন্টারভিউ ৫:

এক যুবক : খরচ বাড়ছে দিনকে দিন। ধাই ধাই করে বাড়ছে। আয় তো সে হারে বাড়ছে না। বরং কমছে। গত ৬ মাস যাবৎ আমার চাকরি নেই। বোঝেন অবস্থাটা। আর কিছু বলতে হবে?

ইন্টারভিউ ৬:

এক তরুণী : গত সপ্তাহে ৬ টার সময় এসে লাইন ধরেছি। তাও এসে সামনে জায়গা পাই নি। গাড়ি আসছে ৯ টায়। দুপুর ২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে শেষে চলে গিয়েছি। পণ্য শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা কোনো সিস্টেম? আজকেও পাব কি না কে জানে!

[সকাল থেকে লম্বা লাইন। রোদে পুড়ে অসুস্থ হয়ে পরে একজন।]

সাংবাদিক : কয়েকটা প্রশ্ন ছিল ভাই।

[পণ্য বিক্রেতা বিক্রি করছে আর কথা বলছে।]

পণ্য বিক্রেতা : এখন না। বেচা-বিক্রি শেষ হোক ভাই।

সাংবাদিক : শেষ হতে ভাই অনেক সময় লাগবে। ছোট ছোট ২টা প্রশ্ন করব শুধু।

পণ্য বিক্রেতা : তাড়াতাড়ি করেন।

সাংবাদিক : বিক্রি কার্যক্রমে শৃঙ্খলার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কারণ কি?

পণ্য বিক্রেতা : কই? কিসের ঘাটতি?

সাংবাদিক : এই যে লাইন টাইনের ঠিক নেই।

পণ্য বিক্রেতা : আমরা কি করুম? আমরা বেচুম না লাইন ঠিক করুম? লাইন ঠিক করার দায়িত্ব কাউন্সিলরের, আমাদের না।

সাংবাদিক : অভিযোগ আছে কেউ দুইবার তিনবার নেয়। আবার কেউ একবারও পায় না।

পণ্য বিক্রেতা : এত খেয়াল কে রাখবো ভাই? বসেন এইখানে। দ্যাহেন আপনে পারেন কি না।

সাংবাদিক : অভিযোগ রয়েছে কিছু ডিলার কালোবাজারির সাথে জড়িত। কিছু পণ্য খোলা বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি করে, যে কারণে এখানে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পায় না ক্রেতারা।

পণ্য বিক্রেতা : যারা করে তারা করে। আমরা করি না। হইছে ভাই। এখন যান। আর কতা কইতে পারুম না।

দৃশ্য ৫

[ইন্টারভিউ শেষ করে কিছু ফুটেজ নিয়ে দু'জন মিলে চা খায় এক দোকানে। জালাল আর ময়না পাশের মুদি দোকানে হাতে ২টা ৫ লিটারের তেলের বোতল নিয়ে ঢোকে। তাদের পিঠে স্কুল ব্যাগ। দোকানদারের সাথে দামদর করে। দরে না মেলায় দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। বিষয়টি চোখে পরে ক্যামেরাম্যানের। সে সাংবাদিককে বিষয়টা জানালে তারা দু'জনে জালাল আর ময়নার পিছু নেয়। জালাল আর ময়না আরেকটি মুদি দোকানে ঢোকে। সেখানে দামে দরে মিলে

গেলে তারা দোকানদারকে তেলের বোতল দু'টি দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের চোখে মুখে আনন্দের ছাপ। সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান তাদের পিছু ছাড়ে না। জালাল আর ময়না ছোট একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে। তাদের টেবিলে গিয়ে হাজির সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান। গিয়েই জেরা শুরু করে। ক্যামেরা অন করে ক্যামেরাম্যান।]

সাংবাদিক : তারপর? কি খবর? তেল চুরি করেছিস কোত্থেকে? স্কুলে তো যাসনি, তাই না?

[তাদের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে জালাল আর ময়না।]

জালাল : চুরি করি নায় বিশ্বাস করেন। আব্বার ধারে কইয়েন না। মাইররা হালাইবে।

সাংবাদিক : চুরি করিস নি তো তেল পেলি কোথায়?

জালাল : টিসিবির ট্রাক দিয়া কিনছি।

ক্যামেরাম্যান : টাকা কে দিছে? তোদের কমিশন কত? তোদের গ্রুপে আর কতজন আছে?

জালাল : কি কন! কিসের কমিশন? কিছুই তো বুজি না।

ক্যামেরাম্যান : বোঝনা না?

সাংবাদিক : তোদের টাকা দিয়ে তেল কিনিয়ে দোকানে বিক্রি করায় না একজন? লাভের টাকার কমিশন দেয় না তোদের?

জালাল : না। বিশ্বাস করেন।

সাংবাদিক : বিশ্বাস পরে করব। খুলে বল। কাউকে কিছু বলব না। তোদেরও ছেড়ে দিব। আর না বললে সোজা পুলিশে দিব।

[জালাল কিছুক্ষণ ভাবে]

জালাল : আব্বারে কইবেন না তো?

সাংবাদিক : সত্যি কথা বললে বলব না। মিথ্যা বললে সব বলে দিব।

[জালাল সব খুলে বলে]

জালাল : ময়না গ্রিল খাইতে চায় অনেকদিন ধইররা। আব্বার ধারে কওয়ার সাওস পাই না। গত বচ্ছর আব্বার চাকরি চইল্লা যাওয়ার পর হইতে হ্যার মাতা নষ্ট। একটা রিক্সা কেনছেলে। কিছু দিন আগে হেডাও চুরি অইচে। আব্বায় ১০ টাহা কইররা দেয় মাজে মাজে। অনেকদিন ধইররা ইট্টু ইট্টু কইররা ১৩০ টাহা জোমাইছি। আইজ আব্বার পকিটদা কিছু টাহা চুরি করচি। স্কুলে যাই নায় আইজ। বেইন্নাকাল হইতে লাইনে খারাই রইছি। দুই

জনে দুই বোতল ত্যাল কিনছি। হেইয়া দোহানে দ্যাশ্যো টাহা লাবে বেচ্চি। আগের জোমাইন্না টাহা আর আইজগোর ত্যাল বেইচ্চা লাবের টাহাইদ্দা ময়নারে গ্রিল খাওয়াইতে আইছি। বাড়ি যাইয়া আব্বার টাহা আব্বার পকেডিই থুইয়া দিমু, জানি ট্যার না পায়। ট্যার পাইলে পিডাইয়া লক্কি ছারাই দেবে। ...একফির কোন আস্কিরিম খাওয়ার ফান্নে পোঞ্চাশ টাহা চুরি কইররা ধরা খাইছালাম। ভবের পিডান পিডাইছে। আমহেগো পাও ধরছি ভাই, আব্বার ধারে কন বুজি!

[জালালের কথাগুলো শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানের। এরকম কিছু শোনার জন্য তারা একদমই প্রস্তুত ছিলেন না। ওয়েটার এসে হাজির হলে সাংবাদিক ২টা গ্রিলের অর্ডার করে।]

জালাল : দুইডা না। একটা। দুইডার টাহা নাই।

সাংবাদিক : সমস্যা নাই। দুইটাই দিন।

[জালাল আর ময়না একটু অবাক হয়। ওয়েটার দুইটা গ্রিল দেয়। জালাল আর ময়না গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

ময়না : আমহেরা খাইবেন না?

ক্যামেরাম্যান : না। তোমরা খাও। আমরা একটু আগে খেয়েছি।

[সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান পরম স্নেহ নিয়ে তাদের খাওয়ার দৃশ্য দেখে। যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য। খাওয়া শেষ হলে সাংবাদিক আরো দু'টি গ্রিল প্যাক করতে বলে ওয়েটারকে।]

দৃশ্য ৬

[এক হাতে পার্সেল আর আরেক হাতে ছোটবোনের কোমল হাত। রাস্তার পাশ ধরে বাড়ির পথে হাঁটছে দু'জন। পার্সেল ঝুলছে। দুলছে। সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে।]

পুঁজিবাদের আল্লার নাম টাকা,

মসজিদের নাম ব্যাংক –*হুমায়ুন আজাদ*

-সমাপ্ত-